সহরতলী

দ্বিতীয় পর্ব্ব

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

উপহার

সহরতলী

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

সহরতলীর রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিন-দিন দ্রুততর হইয়া উঠে।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু আশ্চর্য্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিতে দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এব্ড়ো-খেব্ড়ো রাস্তা নূতন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝক্-ঝক্ করিতেছে, কত আঁকা বাঁকা সরু গলি চওড়া আর সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামী পথের গায়ে আঁটা হইয়া যাইতেছে জম্‌কালো নাম।

চারিদিকে বাড়ী উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরণের সাদাসিদে একতলা দোতলা অনেক বাড়ী অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফ্যাসানে বাড়ী—শুধু গঠনের মধ্যেই কত

কায়দা। এ অঞ্চলে ছোট বড় সব বাড়ীরই প্রায় আকার ছিল চার-কোনা বাক্সের মত, এখন বাড়ীগুলি হইয়াছে ইঁট-কাঠ-চুণ-সুরকি-সিমেণ্ট-লোহার জ্যামিতি। অস্বাভাবিক রূপলাবণ্যের অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাড়ীগুলি যেন দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। শিল্পী ভাস্কর কি মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাই তাল সামলানো যাইতেছে না ?

দোকানপাটের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, পুরানো দোকানের চেহারাও বদলাইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট কত পুরানো দোকান যে উঠিয়া গেল !—ছোট অপরিচ্ছন্ন ঘরে এলোমেলোভাবে জিনিষ সাজাইয়া এতদিন যাদের কাছে মাল বিক্রী করা চলিত তাদের অনেকেই তো নাই, নূতন যারা আসিয়াছে তারা ছবির মত সাজানো দোকান চায়।

বড় রাস্তায় রাস্তার আলোর সংখ্যা আরো জোর বাড়িয়াছে বটে কিন্তু এখন দু'দিকের দোকানের আলোতেই রাস্তাটি এমন ঝলমল করে যে, রাস্তার আলো রাত বারোটা পর্য্যন্ত নিভাইয়া রাখিলেও চলে।

বাজারের সংস্কার হইয়াছে। এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে কেউ আর মাছ তরকারী বেচিতে বসে না, সন্ধ্যার পর বা রের অর্দ্ধেকটা এখন আর আবছা অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় না। দু'বেলা ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করিয়াও অবশ্য বাজারের নোংরামি আর দুর্গন্ধ এখনও দূর করা যায় নাই, কোনদিন যাইবেও না, তবু কুলীর দেহ ভদ্রলোকের দেহে পরিণত হওয়ার মত, বাজারের পরিবর্ত্তন যে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই।

দলে দলে যেসব নর-নারী আসিয়া এ অঞ্চলের নূতন ধরণের বাড়ী-গুলিতে নীড় বাঁধিতেছে, সহরতলী পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনীর সঙ্গে তাদের

চাল-চলন বেশভূষা বেশ খাপ খায়। অনেকে বাস করিতে আসিয়াছে নিজের বাড়ীতে, অনেকে আসিয়াছে ভাড়াটে হইয়া। জমির দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে বড়লোক ছাড়া বাড়ী করিয়া এ-অঞ্চলে বাস করা আর সম্ভব নয়। প্রথমদিকে যারা জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছিল অথবা তৈরী বাড়ী কিনিয়া নিয়াছিল, তারা প্রায় অধিকাংশই না-বড়লোক ধরণের ধনী, বাড়ী করিতেই হয়ত অনেকের জীবনের সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে। তবু এরাই প্রথমে এই সতরতলীকে ফ্যাশনেব্‌ল সহুরে রূপে দিয়াছে, এ অঞ্চলে বাস করার মর্য্যাদা ও সুবিধা বাড়াইয়াছে, আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর আসিয়াছে বড় বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, জমিদার— দশগুণ কম দামে পাঁচ কাঠা জমি কিনিতে একদিন যাকে চোখে অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল তার ছোট বাড়ীখানার পাশে উঠিয়াছে বাগান-ঘেরা প্রাসাদ।

অনেক বস্তির চিহ্নও লোপ পাইয়াছে, কেবল সেগুলি বড় রাস্তার অনেক তফাতে ভদ্র পাড়ার পিছনে পড়িয়াছে সেগুলি টিঁকিয়া আছে,— কোনটা সম্পূর্ণ, কোনটা আংশিক। যশোদার বাড়ীর তিনদিকে নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, কেবল কুমুদিনীর বাড়ী যেদিকে সেদিকটা আগে যেমন ছিল তেমনি আছে। রূপান্তরের ঢেউ যশোদার দুটি মুখোমুখি বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে।

যশোদা বাড়ী দু'টি বিক্রী করিলে সঙ্গে সঙ্গে এদিকের আট দশখানা বাড়ী পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। বিক্রী করিবার জন্য এসব বাড়ী আর ফাঁকা জমির মালিকেরা সকলেই উৎসুক হইয়া আছে, এ অঞ্চলে জমির দাম যে এত চড়িতে পারে পাঁচ সাত বছর আগে কেহ

কল্পনাও করিতে পারে নাই। সব বেচিয়ে দিয়া সহরের আরও তফাতে সস্তায় জমি কিনিয়া আবার তারা বাড়ী-ঘর তৈরী করিয়া নিবে, একটা মোটা টাকা হাতে থাকিয়া যাইবে। এখন তাদের ভয় শুধু এই, হঠাৎ জমির দাম না কমিয়া যায়।

কিন্তু যশোদার জন্য কেউ তারা বাড়ী বিক্রী করিতে পারিতেছে না। যে কোম্পানী সমস্ত পাড়াটা চড়া দামে কিনিতে চায়, মাঝখানে যশোদার বাড়ী দু'টি বাদ পড়িলে তারা বেশী দাম দিবে না। সকলেই যদি বেচিতে রাজী হয়, এক কাঠা জমিও বাদ না পড়ে, তবেই যশোদার বাড়ীর এপাশের জমির দরটা তাদেরও দেওয়া চলিতে পারে--নয়তো অত দামে ছাড়া-ছাড়া জমি কিনিয়া কোম্পানীর কি লাভ হইবে ?

এইসব বাড়ীর মালিকেরা একত্র হইয়া অনেক পরামর্শ করিয়াছে, যশোদাকে বুঝাইয়াছে, অনুরোধ করিয়াছে, ভয়ও দেখাইয়াছে। কুমুদিনী যে তাকে কত খোঁচাইয়াছে বলিবার নয়। কুমুদিনীর বাড়ীটি ছোট, কিন্তু যায়গা অনেক। বাড়ীর পিছনে তার একটি ছোটখাট বাগান আছে, পেয়ারা, লেবু, ডালিম গাছে বাগানটি ঠাসা। অনেকগুলি টাকা হাতে পাওয়ার সখটা কুমুদিনীর চিরদিনই বড় প্রবল। টাকা হাতে পাওয়ার সখটা অবশ্য কারও কম থাকে না, কিন্তু একসঙ্গে মোটা টাকা পাওয়ার জন্য কুমুদিনীর মনটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী ছটফট করিতেছে।

তারপর মনের অশান্তি আর সকলের পীড়াপীড়িতে অস্থির হইয়া উঠিয়া বাড়ী বেচিতে যশোদা যদি বা রাজী হইয়াছিল, শেষমুহূর্তে হঠাৎ আবার তার মন বদলাইয়া গেল।

সামান্য একটা উপলক্ষ্যে।

বাড়ী বেচিতে রাজী হওয়া মাত্র যশোদা বলিল, 'তবে আর এবাড়ীতে আমি একটা দিনও থাকবো না। আমি চললাম।'

কুমুদিনী, রাজেন আর ধনঞ্জয় তিনজনেই ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'চললে? কোথায় চললে তুমি বলা নেই কওয়া নেই?'

যশোদা হাসিল। যশোদার সেই শান্ত কৌতুকভরা হাসি দেখিয়া সকলে স্বস্তি বোধ করিল। না, রাগে দুঃখে বিরক্তিতে মাথা যশোদার বিগড়াইয়া যায় নাই।

—'দু'দিন একটু ঘুরে আসবো।'

রাজেন বলিল, 'কোথায় যাবে?'

যশোদা বলিল, 'চুলোয়। কুঁড়ে পাও, গোয়াল পাও একটা ঠিক করে রেখো দিকি আমার জন্যে—পশু এসেই জিনিষপত্তর নিয়ে উঠে যাব।'

কুমুদিনী মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, 'হুঁ, জিনিষপত্তর! জিনিষপত্তর বেঁধেছেঁদে রাখতে হবে তো আমাকে?'

'তোকে তো আমি বলিনি সই!'

কারও কাছে মনের কথা ফাঁস না করিয়া যশোদা বাড়ী ছাড়িয়া সহরের এক সস্তা হোটেলে গিয়া উঠিল। কিছুদিন হইতে যশোদা ভাবিতেছিল, রীতিমত একটা হোটেল খুলিয়া নিজের চারিদিকে আবার কতকগুলি মানুষ জড়ো করিয়া অনাত্মীয় মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া দিয়া দিন কাটাইবে। কিন্তু দু'টি দিন সেই আদর্শ ও পবিত্র হোটেলে কাটাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, এই সব কলমপেষা কুলীরা

কারো সঙ্গে সুখ দুঃখের উপভোগ ভাগাভাগি করে না, যেটুকু করে সেটুকু শুধু মৌখিক ভদ্র আলাপে চল্‌তি শব্দের আদান প্রদান। সহানুভূতি কাকে বলে কেউ জানে না, চায় না এবং পায়ও না।

ক্ষুণ্ণ-মনে যশোদা তাই ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, কুমুদিনী সত্যই তার সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সহরের অন্তপ্রান্তে একটি বাড়ীও রাজেন ঠিক করিয়াছে, সকলে মিলিয়া এখন সেখানে গিয়া উঠিবে তারপর যা ব্যবস্থা হয় করা হইবে। যশোদা চলিয়া যাইবে আর তারা এখানে পড়িয়া থাকিবে, কুমুদিনীর তা সহ্য করা অসম্ভব। শত্রু যদি চোখের আড়ালেই চলিয়া গেল, দিন তার কাটিবে কি করিয়া ?

যশোদা রাজেনকে বলিল, 'তোমাদের যাবার তাড়াতাড়ি কিসের ?'

রাজেনের হইয়া কুমুদিনী জবাব দিল, 'তোমারি বা তাড়াতাড়িটা কি শুনি ?"

যশোদা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আমার কথা আলাদা। একা মানুষ আমি, দু'দিন আগে যাই পরে যাই, কারো কিছু এসে যাবে না! তোমরা কেন মিছিমিছি দু'চার মাস আগে থেকে ঘর ছাড়া হবে ?'

কুমুদিনী মুচকিয়া একটু হাসিল।—'আমরাও তো একা মানুষ চাঁদের মা নাই ?—দু'টি একা মানুষ।'

রাজেন ও কুমুদিনী চলিয়া গেলে বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হইয়া যশোদা বাড়ীর উনুনগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে গেল।

যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙ্গিয়া

গেল। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার সময় নাকি উনুন ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে হয়।

মেয়েলি শাস্ত্রের এসব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিয়া চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনুন ভাঙ্গিতে হইবে এমন কোন নির্দ্দেশও এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙ্গিবার জন্ত এরকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা আশ্চর্য্য নয়।

উনুন ভাঙ্গিল, একটি পা-ও জখম হইল যশোদার। লোহার একটা শিক ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙ্গা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল রক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিয়া এক পায়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় যশোদার কীর্ত্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, 'দেখলে ?'

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতমত খাইয়া যায়।

পা কাটা যাওয়ার পর কিছুদিন সে সামান্ত কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুষী আর পাগলামী তার আসিয়াছিল হিসাব হয় না। তারপর ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময়েই প্রায় বিষণ্ণ ও অন্তমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোন বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয় না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে

অচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। কেমন একটু বোকা হাবার মত হইয়া পড়িয়াছে মানুষটা।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে একটু তার সময় লাগে, কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যেন সজীব হইয়া উঠে অতিমাত্রায়। বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া হ্যাংচাইতে হ্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নূতন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ব্যাকুলভাবে বলে, 'ডাক্তার ডেকে আনি ?'

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, 'ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।'

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, একপায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগল-লাঠি তুলিয়া নিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে, 'হুটোপুটি ক'রো না বাবু, ধীরে সুস্থে আনো।'

'রক্ত পড়ছে যে গো !'

'কই রক্ত পড়ছে ? টিপে ধরে' আছি দেখছো না ?'

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনানের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দু'বেলা এই উনুনে বিশ পঁচিশ জনের রান্না করিত যশোদা, কুলী মজুরের মোটা ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়ীতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ীর একটা মেয়েকে চুরি করিয়া ভাইটা পর্যন্ত তার কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে, 'ও চাঁদের মা, ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না ?'

'ছোট টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড় আছে একটা, সেইটে নিয়ে এসো।'

নির্দ্দেশ দিয়া বলিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবি বন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, একথা তার মনে আছে। তবু সে আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙ্গুলের ছিপি খুলিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙ্গা মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড় ভাল লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভাল লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

'টিপে ধর, টিপে ধর, শীগ্‌গির টিপে ধর।'

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, 'কি করে' খুললে বাস্‌কো ?'

'টেনে খুলেছি।'

'তার মানে বাস্‌কোর তালাটি ভেঙেছো আমার। ধন্য তুমি।'

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মত গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়ীটা বিক্রয় করিতে পর্য্যন্ত বাকী আছে, কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করা, ভারি ভারি

জিনিষপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে সহরের অপর প্রান্তের আরেক সহরতলীর ভাড়াটে বাড়ীতে, রওনা হওয়ার আয়োজন, শুধু বাকী আছে ; গাড়ী ডাকিয়া বাকী জিনিষপত্র নিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসার, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ করিয়া হঠাৎ বাঁকিয়া বসার কোন অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা এ বাড়ী ছাড়িয়া এদিকের সহরতলী ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। তবু শেষ মুহূর্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

ধনঞ্জয় বলিল, 'এ পা নিয়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে চাঁদের মা !'

যশোদা চুপ করিয়া রহিল। তার এই গাম্ভীর্য্য ধনঞ্জয়ের কাছে চিরদিন বড় অস্বস্তিকর। একটু ভয়ে ভয়ে সে বলিল, 'খুব ব্যথা করছে তো ?'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'কিসের ব্যথা ? আমার আবার ব্যথা-বেদনা কিসের শুনি ?'

ধনঞ্জয় আরও দমিয়া গেল।—'পায়ের কথা বলছি গো। তোমার ওই পায়ের কথা যাতে শিক বিধেছে। কম লেগেছে তোমার পায়ে !'

'না লাগেনি, একটুও লাগেনি। আমার আবার লাগালাগি কি ? মুখপোড়া ভগবান আমায় লোহা দিয়ে গড়েছে জান না ?'

ধনঞ্জয় বলিল, 'গাড়ী ডাকি তবে ?'

যশোদা বলিল, 'থাক।'

'আজ যাবে না ?'

'না।'

ধনঞ্জয় খুসী হইয়া বলিল, 'আমিও তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কি আছে ? পায়ের ব্যাথাটা কমুক, দু'দিন পরে গেলেও চলবে।'

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মত বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল।—'তোমার পা দু'দিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।'

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদের ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নীচেই ডান পা'টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনো বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখিয়া বিব্রত হওয়ার মত।

'আমারও ডান পা'টা জখম হয়েছে, দেখেছ ?'

এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য যোগা-যোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'হয়তো আমার পা'টাও তোমার মত কেটে বাদ দিতে হবে।'

'না না, তা কি হয়, কি যে বল তুমি চাঁদের মা !'

'হতে পারে তো ? পা'টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়, তারপর ডাক্তার করাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মত করে' দেয়, বেশ হয় তা হ'লে, না ?'

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতর বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা'টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পারে এবং শেষ

পর্য্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ওরকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এই জন্যই, এরকম ছেলেমানুষী কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমত আবেগের সঙ্গে, যেটা তার পক্ষে আরও বেশী অস্বাভাবিক, সেইজন্য মনে হয় সে যেন তামাসা করিতেছে।

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

'আমার সঙ্গে তামাসা করছ চাঁদের মা ?'

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, 'না, তামাসা করিনি। মনটা ভাল নেই কিনা, তাই কি বলতে কি বলেছি। বাড়ী-ভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই, কি অদেষ্ট বলত আমার ?

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার, আর বিহ্বলের মত তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা কি কোনদিন নজরে পড়িয়াছিল তার ? যশোদা যে কাঁদিতে পারে, আর দশজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখ, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়ীতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোষের দুই প্রান্তে দু'জনে বসিয়াছিল। তক্তপোষের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল,

কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়' যেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল, বলিল, 'হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর করে' কান্না থামাচ্ছ ?'

ধনঞ্জয়ের জন্যই এবার যশোদার মন আরও খারাপ হইয়া যায়। বড় আত্মগ্লানি সে বোধ করে। নিজের উপর রাগ ধরিয়া যায়। ধনঞ্জয় ছেলেমানুষ—বয়সে না হোক মনের দিক দিয়া সত্যই বড় ছেলেমানুষ। অতি তুচ্ছ একটু সাধারণ অন্তরঙ্গতাই যে মানুষটাকে খুসীতে গদগদ করিয়া দেয়, হাতে খেলনা পাওয়া শিশুর মত, অনেক বার সে তার প্রমাণ পাইয়াছে। কতবার সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, লোকটার সঙ্গে কথায় ব্যবহারে একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। কোনমতেই তো কথাটা সে মনে রাখিতে পারে না ! সকলে তাকে ত্যাগ করিয়াছে শুধু ধনঞ্জয় ত্যাগ করে নাই, এই ভাবটাই শুধু মনে থাকিয়া যায়। তাকে ত্যাগ করার কারণ যে ধনঞ্জয়ের নাই, উপায়ও নাই, এটা যেন খেয়ালও থাকে না !

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনো যশোদার উঠানে ভাল করিয়া রোদ আসে নাই। পূবে একটি নূতন তিনতলা বাড়ী উঠিয়াছে, যশোদার বাড়ীটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নূতন রাস্তাটির সোহাগে চারিদিকের বাড়ী যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মত। কতটুকু সময়ের

মধ্যেই প্রকাণ্ড এক একটা বাড়ী যে সম্পূর্ণ হইতেছে! কোন কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—সহরের মানুষের। নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে ম্যাজিকের মত কাজ হইয়া যায়।

ঘরের মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, একটুকরা ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা কিছু পরিত্যজ্য সব যশোদা চিরদিন নির্বিকার চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মত ভীরু সে কোনদিন ছিল না। শুবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মত এত জঞ্জাল যে ঘরের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া ছিল!

শূন্য দেয়ালে শুধু নানা রকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেয়াল-পঞ্জী,—জীবনবীমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। দেয়াল-পঞ্জীর ছবিটিতে একজোড়া নারী ও পুরুষ ও তাদের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য আর মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেষারেষি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে।

অনেক বিষয়ের মত এবিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগও তার ঘটে নাই, মুখে ফেনা তুলিয়া জাবরও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয়

একথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকার হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবীমা কোম্পানীর দেয়াল-পঞ্জীর ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি আবস্তব মধুর কল্পনা।

'আগে ঘরদোর ভালো করে' সাফ করিয়ে তারপর জিনিষপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন?'

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, 'সেই ভাল। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না?'

'কেন পারব না? কি হয়েছে আমার?'

'না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দি', শুয়ে থাকো।'

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল একপায়ে ভর দিয়া। একটু হাসিয়া বলিল, 'এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে' চল বাইরে।'

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, নন্দের তো জেল হবে?'

এতবড় গুরুতর বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করায় খুসী হইয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'মেয়েটির বাড়ীর লোক যদি গোলমাল করে—'

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ীর লোকেরা কি করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ম্ময়

একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া যশোদার ভাই কোথায় গিয়াছে, এ খবরটা কি সে রাখে? হয়তো জ্যোতির্ম্ময় পুলিশে খবর দিয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দু'জনের সন্ধান পাইলেই নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে সেই জানে। হয়তো দূরে কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোন বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্ত্তিকথা গোপন করিয়া চুপি চুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিবে—তারপর যা হবার হোক।

এসব কথাই যশোদা আজ ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে যে অনেকবার বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক তার কিছু আসিয়া যায় না। ও নচ্ছরটার সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোন দোষ নাই? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ, ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুপ করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয়া সম্ভব? কাঁচ-পোকার আর্সোলাকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মত সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপিয়ে একা নন্দের ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দু'জনের বিবাহ দিয়া দেওয়া যায় না? জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজী হইয়া যাইতেও পারে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে সে সুখের অভাবও অনেক ভাল।

'কিন্তু বিয়ে কি হবে?'

ধনঞ্জয় চমকাইয়া উঠিল।—'বিয়ে? কার বিয়ে?'

ধনঞ্জয়ের সেই চমক দেখিয়া, চমকের মানে বুঝিয়া, যশোদার মনের মেঘ ফাঁক হইয়া কোথা হইতে যেন খানিকটা সোনালী রোদ আসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়ের হাঁটুতে টোকা দিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, 'কেন, তোমার বিয়ে? আমার সঙ্গে?

এবেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দু'জন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর-দুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিঁড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্নাঘরে তৈরী করিতে বসিল ছোটখাট একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরী করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিল, 'দু'চার দিনের জন্য আবার উনুন পাতছ কেন?'

ইঁটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল, 'দু'চার দিন কে বললে? থাকতে হ'লে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো? না, ফলার করবো রোজ?'

'ক'দিন থাকবে?'

'চিরদিন।'

'এখান থেকে যাবে না?'

'কেন যাব?'

'বাড়ী বেচবে না ?'

'কেন বেচব ?'

'ওবাড়ীতে যে মালপত্র গেছে ?'

'আনিয়ে নেব। ওবেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গরুর গাড়ীতে মাল গেছে, একেবারে একটা লরীতে মাল ফেরৎ আসবে।'

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদি-অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়ীতে কেবল সে আর যশোদা ক'দিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কি ফিরিবে না একথা কারও জানা ছিল না, কোন কারণে ফিরিতে তার দেরী হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মত ঘুমও আসিয়াছিল দু'জনের। পরদিন যশোদার সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, 'আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে ?'

যশোদার বাড়ী হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা একবাড়ীতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, 'আমার সুনাম দুর্নামে কার কি আসবে যাবে বল্, কে আছে আমার ? দুর্নাম হতে বাকীই বা কি আছে বল্ ? আমার ভাই মন্দ, আমিই বা মন্দ নই কিসে ?

শেষ পর্য্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল।

অনেক ভাবিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত কল্পনারাজ্যে অনেকক্ষণ বিচরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা ? তোমার হয় তো ভয় করবে ?'

'ভয় করবে ?'—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, 'আমায় ভয় করবে একা এক ঘরে শুতে ! গোটা বাড়ীটাতেই আমি যে আজ একা থাকবো গো ?'

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না।

যশোদা আবার বলিয়াছিল, 'তুমি শোবে সই-এর বাড়ীতে, পূবের ঘরে।'

এই বাড়ীতে যশোদার সঙ্গে রাত্রি যাপনের মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, কুমুদিনীর বাড়ীতে তাকে রাত্রে থাকিতে হইবে শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাজেন আসিল। লরীতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল।

'রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কি চাঁদের-মা ? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকছি সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব ?'

'কেন, সেখানে রাত কাটাবার তোমার দরকার ? হরনাম সিংকে বলোগে' আমার নাম করে' গাড়ী আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই সব ব্যবস্থা করে' দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ী পাওয়া যাবে না।'

'কি বকশিস্ দেবে আমাকে ?'

'রত্তিরে আমায় পাহারা দিও।'

রাজেন হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই রাজেন তার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে রাজেন বেশী মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দু'জনকে কথা বলিতে দেখিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া যায়, দু'তিন দিনের জন্য যশোদাকে একেবারে ত্যাগ করে। তারপর নিজেই আবার ভাল করিতে আসে। তীক্ষ্ণ কথা আদান-প্রদানের ভাব। দিনান্তে একবার যশোদা কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভাল লাগে না, সারারাত মেজাজ তার এমন গরম হইয়া থাকে যে রাজেনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

রাজেন বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ওকে থাকতে বললে যে তোমার কাছে?'

লণ্ঠনের আলোয় ধনঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া যশোদা রাগ করাব বদলে শান্তভাবেই বলিল, 'মাথা খারাপ না কি তোমার? তামাসা বোঝ না?'

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মত আব্দার করিয়া বলিল, 'ওরকম তামাসা আর কোরোনা, বুঝলে? লড় খারাপ লাগে শুনলে।'

যশোদা কথা বলিল না। ধনঞ্জয়ের কথা শুনিয়া তারও খারাপ লাগিতেছিল।

দুই

যশোদা বাড়ী বেচিবে না শুনিয়া সবচেয়ে বেশী গোলমাল করিল কুমুদিনী।

একা এক বাড়ীতে থাকার জন্য বটে, বাড়ী বিক্রী করিতে অস্বীকার করার জন্যও বটে। প্রথম কারণটা নিয়া সকালবেলা ঘণ্টা দুই ঝগড়া করিয়া ফুঁসিতে ফুঁসিতে বেচারী সবে বাড়ী গিয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্য ব্যাপারটা কানে আসিল। হাঁড়ি নামাইয়া আবার সে ছুটিয়া যশোদার কাছে।

'এটা কি শুন্‌ছি চাঁদের-মা সই ? বাড়ী নাকি তুই বেচবি না ?'

যশোদা উনানে হাঁড়ি চাপাইতেছিল, সংক্ষেপে জানাইল, 'উঁ হুঁ।'

'কেন শুনি ? তোর একার জন্য সবাই মরব আমরা ? আমরা তোর কি করেছি, নিজের ক্ষতি ক'রেও আমাদের সব্বোনাশ করবি ? তুই কি পাগল নাকি চাঁদের-মা সই, মাথা কি তোর খারাপ ?'

'মাথা নয়। কপাল খারাপ।'

আরও চটিয়া কত কথাই যে কুমুদিনী বলিয়া যায়। যশোদা বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ শুনিয়া যায়, মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। এইমাত্র ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঝগড়া করিয়া গিয়া কুমুদিনী বোধ হয় একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রথমদিকে কথাগুলি তার তেমন ঝাঁঝালো হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে মেজাজ চড়িতে থাকায় সে যশোদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। মনে হয়, এতকাল শুধু যশোদার

দোষের অফুরন্ত তালিকা মুখস্থ করিয়া সে দিন কাটাইয়াছে, যশোদার মত খারাপ মেয়েমানুষ যে জগতে আর দু'টি নাই এ কথাটা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না।

শেষে যশোদা বলে, 'এদিকে তুই তো আলাপ করছিস আমার সঙ্গে, আরেকজন যে না খেয়ে কাজে গেল?'

'যাক্। আরেকজনের জন্য তোর অত দরদ কেন শুনি?'

'পীরিতের মানুষটার জন্য দরদ হবে না?'

কুমুদিনী মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'তা তামাসা আর করছো কেন? পীরিত যে তোমাদের ঢের দিন থেকে চলছে, তা কি আর জানিনে আমি?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কত গণ্ডা লোকের সঙ্গে যে তুই আমার পীরিত ঘটিয়ে দিলি ভাই! কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল—'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া একটা অতি কুৎসিত মন্তব্য করিয়া নিজেই একটু থতমত খাইয়া যায়—কথাটা তার নিজের কানেই বীভৎস শোনায়। এতক্ষণ চটে নাই কিন্তু এবার যশোদা চটিয়া উঠিবে ভাবিয়া কুমুদিনীর একটু ভয়ও বুঝি হয়। চিরদিন সে যশোদাকে ভয় করিয়া আসিয়াছে। রাগ না করিয়া যতক্ষণ যশোদা আমল দেয় ততক্ষণই সে ঝগড়া করে, যশোদা রাগ করিলেই তার কান্না সুরু হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি সামলাইয়া নিয়া নরম গলায় সে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কেন বাড়ী বেচবি না বলতে তো দোষ নেই ভাই চাঁদের-মা সই?'

কুমুদিনীর তকথ্য মন্তব্যে যশোদা রাগ করিয়াছে কিনা বোঝা যায় না, কেবল মুখখানা তার একটু গম্ভীর দেখায়। একটু ভাবিয়া সে

বলে, 'না, বল্‌তে আর দোষ কি? সত্যপ্রিয় কিনে নিচ্ছে তো ঘর-বাড়ী—ওকে আমি বেচব না, লাখ টাকা দিলেও নয়।'

'সত্যপ্রিয়বাবু তো কিনছে না? একটা কোম্পানী থেকে কিনছে।'

'ওটা সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী। লোকটা আমার ঘর ভেঙ্গেছে, আমার বদনাম রটিয়েছে, ওকে আমি বাড়ী-ঘর বেচব? সবাই কত ভালবাসত আমায়, এখন একজন আসে দেখিস্‌ আমার কাছে? কত করেছি ওদের জন্যে আমি, আজ ওরা আমায় বল্‌ছে সত্যপ্রিয়ের লোক, সত্যপ্রিয়ের টাকা খেয়ে ওদের বন্ধু সেজে ওদের সর্ব্বনাশ করেছে?

এভাবে কোন বিষয়ে নালিশ করা, অভিমানে এভাবে বিচলিত হওয়া যশোদার স্বভাব নয়। বন্ধুরূপী শত্রু বলিয়া কুলি-মজুরেরা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনটা কি যশোদার এত নরম হইয়া গিয়াছে?

কুমুদিনী একটু ভাবিয়া বলে, 'তা এক দিক দিয়ে তো ভালই হয়েছে ভাই চাঁদের-মা সই? কতকগুলো কুলি-মজুরদের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছিলে, বেঁচে গেছ। এখন অন্য ভাড়াটে রাখো বাড়ীতে,—না না, ভাড়াটে রাখবে কি ক'রে, বাড়ী তো তুমি বেচে দিচ্ছে।' বলিয়া কুমুদিনী একগাল হাসিল।

কিন্তু যশোদার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন তখন যশোদার কাছে ছুটিয়া আসে, মত বদ্‌লানোর জন্য ঝগড়া করে, অভিশাপ দেয় আর মিনতি করে, মাঝে মাঝে ধনঞ্জয়কে পর্য্যন্ত মধ্যস্থ মানে।

ধনঞ্জয় দ্বিধাভরে বলে, 'আমি তো বল্‌ছি প্রথম থেকে কিন্তু—'

যশোদা বলে, 'কি মুস্কিল, তোমরা বেচ না তোমাদের ঘর-বাড়ী।

আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি? আমায় নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

যশোদার বাড়ী বেচার সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্পর্ক কোথায়, কেবল কুমুদিনী নয় পাড়ার সকলেই অনেকবার কথাটা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যশোদা স্বীকার করে না। সে বলে, সব সত্যপ্রিয়ের চাল। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, অন্য ক্রেতা আসুক, যশোদার বাড়ীশুদ্ধ কিনিতে পাইলে যে দর সত্যপ্রিয় দিবে বলিয়াছে তার চেয়ে বেশী দর দিয়া তখন কিনিয়া নিবে, যার খুসী বেচিবে যার খুসী বেচিবে না, সত্যপ্রিয় কথাটি বলিবে না।

'জমির দর চড়ছে দেখছ না দিন দিন? বেচিবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

রাজেনও যশোদার কথায় সায় দেয়—চিরদিন দিয়া আসিতেছে। তবে কুমুদিনীকে জানাইয়া নয়। কুমুদিনীর কাছে সে যশোদার কথার জোরালো প্রতিবাদই করে।

তারপর একদিন দেখা যায়, যশোদার কথাই ঠিক। পেন্সনভোগী এক ভদ্রলোক রাজেনের বাড়ীর পাশে উমেশ তরফদারের বাড়ীটা এবং ওই ভদ্রলোকেরই এক বন্ধু কানাই নন্দীর এগার কাঠা ফাঁকা জমিটুকু কিনিতে রাজী হইয়া গেল—যশোদা বাড়ী বেচিলে সত্যপ্রিয়ের কোম্পানী যে দর দিবে বলিয়াছিল সেই দরে। কিন্তু পেন্সনভোগী ভদ্রলোক ও তার বন্ধুর আর এখানে বাড়ী বা জমি কেনা হইল না। কোম্পানীর লোক আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যশোদা যে শত্রুতা করিয়া নিজের বাড়ীটা আটকাইয়া রাখিতেছে এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

একজনের সয়তানিতে সকলে মারা পড়িবে কোম্পানী তা সহ্য করিবে না। যে বেচিতে চায় তার বাড়ী আর জমিই কোম্পানী কিনিয়া নিবে। যে বেচিবে না তার সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে পরে।

শুনিয়া যশোদা বলিল, 'বুঝাপড়া ? আবার কি বুঝাপড়া করবে ওরা ? বুঝাপড়ার দেখছি শেষ নাই ওদের !'

বিনাসর্ত্তে সকলের বাড়ী ও জমি সত্যপ্রিয়ই কিনিয়া নিল। বেচিল না কেবল কুমুদিনী।

এতকাল কয়েক হাজার কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া, যশোদার সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া করিয়া, শেষ মুহূর্ত্তে সে বাঁকিয়া বসিল। কৈফয়ৎ দিল এই : 'আরও দাম চড়ুক, তখন বেচব।'

তারপর কয়েকদিন কুমুদিনী আর যশোদার কাছে আসে না। রাজেনের কাছে খবর পাইয়া যশোদা নিজেই তাকে দেখিতে গেল। কুমুদিনীর সাত বছরের ছেলেটাকে এক হাতে ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া বলিল, 'কি হ'ল ভাই কুমুদিনী সই, বাড়ী যে বেচলে না ?'

'তুই যে বেচলি না ? দাম চড়লে তুই যখন বেচবি, আমিও তখন বেচব।'

'তবে আর তুই বেচিছিস্।'

অনেকদিন পরে আজ যশোদার বড় আমোদ ও আনন্দ বোধ হয়। মানুষকে মানুষ ভালবাসে বৈকি। সকলে না হোক, নাটকীয় ভালবাসা না হোক, দু'চারজন সত্যই ভালবাসে। কুমুদিনীর অন্তহীন কটু কথায় তার যে একটুও রাগ হয় না, কুমুদিনীকে সে ভালবাসে বলিয়াই তো ?

তাকে ফেলিয় একা একা কুমুদিনী যে বাড়ী-ঘর বেচিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে না, কুমুদিনী তাকে ভালবাসে বলিয়াই তো ?

তার বেশী আর কি চাই মানুষের ?

কুমুদিনীর ঘরভরা ছেলেমেয়েদের কলরব শুনিতে শুনিতে যশোদার বিরাট দেহটি অবসন্ন হইয়া আসে। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সে তো জানে না মনের মধ্যে গভীর অশান্তির গুরুভার বহিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মুক্তি পাইলে শুধু মন নয় শরীরটাও মানুষের আশ্চর্য্যরকল হাল্কা মনে হয়, শান্তি যেন আসে ঘুমের ছদ্মবেশে। ঘুমের মতই হয়তো অস্থায়ী, তবু এখন যশোদার মনে যে শান্তি আসিয়াছে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজী নববর্ষ সুরু হয় শীতকালে। রাজেন পরামর্শ দিল, ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন আবার হোটেল খুলিলে কেমন হয় ? কারখানার কুলি-মজুরদের জন্য না হোক, কারখানার বাহিরে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাদের জন্য ? যশোদারও তো জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে ! বিশেষতঃ ধনঞ্জয়ের মত বিরাটকায় একটি পোষ্য যখন তার জুটিয়াছে।

যশোদা বলিল, 'কিছুদিন যাক।'

রাজেনও সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাক কিছুদিন।'

দিন যায়। নন্দ ও সুবর্ণের কোন খবর আসে না। কোথায় কি ভাবে ওরা দিন কাটাইতেছে কে জানে ! দিন ওদের চলিতেছেই বা কি

করিয়া? নন্দ কি রোজগারের কোন উপায় করিতে পারিয়াছে? সুবর্ণের গায়ের গয়না একটি একটি করিয়া স্যাকরার দোকানে যাইতেছে হয় তো! নন্দর মত ছেলে, দু'দিন আগেও দিদি মুখে তুলিয়া না দিলে যে প্রায় খাইতেই জানিত না, একটা মেয়েকে চুরি করিয়া পালাইয়া এতকাল সে যে কেমন করিয়া ব্যাপারটার জের টানিয়া চলিতেছে, ভাবিলেও যশোদা অবাক হইয়া যায়।

মাঝে মাঝে নন্দর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য যশোদার জোরালো ইচ্ছা জাগে। কীর্ত্তন করিলেই নন্দর শরীর খারাপ হয় বলিয়া নন্দর কীর্ত্তন করা যশোদা আগে পছন্দ করিত না, যদিও কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সকলের মত অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেগে সেও চিরদিন এক দুর্ব্বোধ্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে তার মনে হয়, নন্দ থাকিলে নিজেই নন্দকে গাহিতে বলিয়া একদিন সে ভাল করিয়া তার কীর্ত্তন শুনিত।

জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে রাস্তায় একদিন যশোদার দেখা হইয়া গেল। একটি নূতন শ্রমিক-সমিতি সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যশোদাকে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছিল, যাওয়ার ইচ্ছা তার একেবারেই ছিল না। আবার শ্রমিকদের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে যাইবে, তার কি লজ্জা নাই? পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত তাকে যাইতে হইয়াছিল। সভায় গিয়াই সে টের পাইয়াছিল, তার অনুমানই ঠিক। সমিতিটি খাঁটি শ্রমিক-সমিতি নয়, একজন ভদ্রলোক নিজের স্বার্থের জন্য সমিতি গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা চলিয়া আসিয়াছিল—বাঁচিয়া

থাকিতেই যারা মরিয়া আছে তাদের ভাল করার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের এসব চেষ্টা সে সহ্য করিতে পারে না।

ফিরিবার সময় তার বাড়ীর গলি আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড তিনতলা নতুন বাড়ীটার সামনে দু'জনে মুখোমুখি হইয়া গেল। বড় বাড়ীটার নীচের একটা অংশে চায়ের দোকান. জ্যোতির্ম্ময় বোধহয় চা খাইয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এত কাছে বাড়ী জ্যোতির্ম্ময়ের, দোকানে তার চা খাওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছে কে জানে! বাড়ীতে কি জ্যোতির্ম্ময়ের যাইতে ইচ্ছা হয় না, যে বাড়ীতে একদিন তার একটা বৌ আর একটা বোন ছিল, যে বৌটা মরিয়াছে হাসপাতালে আর যে বোনটাকে চুরি করিয়াছে যশোদার ভাই?

কিছুদিন একটানা কঠিন অসুখে ভুগিলে যেমন হয় সে রকম নয়, জ্যোতির্ম্ময় বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। যশোদার সঙ্গে কথা না বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া দাঁড়াইল।

'কোন খবর পাওনি, না?'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

জ্যোতির্ম্ময় আনমনে কি যেন একটু ভাবিল। পথে মানুষ ও গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, পথের দু'দিকের চেহারা এত বেশী বদলাইয়া গিয়াছে যে যশোদার মনে হয়, এ বুঝি তার বাড়ীর কাছের সেই পথটি নয়, দূরে অন্য কোথাও আসিয়াছে।

'খবর একটা পাওয়া যাবে চাঁদের-মা, কি বল?'

'তা পাওয়া যাবে বৈকি। আজ হোক কাল হোক, নিজেরাই একটা খবর ওরা পাঠাবে।'

'তোমায় যদি আগে জানায়, আমাকে জানাবে তো সঙ্গে সঙ্গে? আমায় খবর দিতে হয়তো ওদের ভয় হবে।'

'আপনাকে জানাবো বৈ কি। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আপনি কি করবেন?'

প্রশ্ন শুনিয়াই জ্যোতির্ম্ময় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, 'সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে চাঁদের-মা। নিজের বোনকে তো আর ফাঁসি দেব না আমি?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনে সে কি যেন ভাবিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি চাঁদের-মা। নন্দ কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে, এই কথা বলছো তো সবাইকে?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ধরণের কথাই বলেছি। পাটনায় একটা চাকরী পেয়েছে। জ্ঞান হবার পর এই বোধ হয় প্রথম মিছে কথা বললাম জ্যোতিবাবু।'

জ্যোতির্ম্ময় খানিকক্ষণ যেন অবাক হইয়াই যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কথা বলিল বড় খাপছাড়া।

'বাহাদুরী কোরো না বেশী।'

গট্‌গট্‌ করিয়া সে চলিয়া গেল বাড়ীর উল্টা দিকে। গলিতে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া যশোদা দেখিতে পাইল, আবার সে ফিরিয়া আসিতেছে। আরও কিছু তার বলিবার আছে ভাবিয়া যশোদা একটু দাঁড়াইল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, সোজা আগাইয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত যশোদা অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি হইয়াছে জ্যোতির্ম্ময়ের? সে কি পাগল হইয়া যাইতেছে? জ্যোতির্ম্ময়ের মন কে

কত দুর্ব্বল যশোদার অজানা ছিল না। তাই তার চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্ত্তা চালচলনে মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া যশোদা ভয় পাইয়া গেল।

অনেকদিন পরে সত্যপ্রিয়কেও আজ যশোদা দেখিতে পাইল। জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই।

প্রথমে চোখে পড়িল সত্যপ্রিয়ের গাড়ী, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা আগাইয়া গিয়া দেখা গেল সত্যপ্রিয়কে। দু'জন সাহেবী পোশাক পরা লোকের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সে গাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব নূতন কেনা জমি ও বাড়ীগুলি দেখিতে এ পাড়ায় আসিয়াছে।

পথের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুইজন চলিতেছিল, যশোদা কল্পনাও করে নাই সত্যপ্রিয় তার সঙ্গে কথা বলিবে। পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সত্যপ্রিয় বলিল, 'কেমন আছ চাঁদের-মা ?'

কাছে গেল না, শুধু দাঁড়াইল। যশোদাও পথের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া পড়িল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'ভাল আছি। আপনি ভাল তো ?'

সত্যপ্রিয়র সঙ্গের লোক দু'জন বিস্মিত চোখে চাহিয়া আছে। একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টা বাজাইয়া চলিয়া গেল। পথের মাঝে এ ভাবে পীড়ন করা কেন? এত করিয়াও কি সত্যপ্রিয়ের সাধ মেটে নাই ?

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

সত্যপ্রিয় চলিতে আরম্ভ করিল। যশোদা একমুহূর্ত্ত নড়িতে পারিল না। তার চোখে হঠাৎ জল আসিয়া পড়ায় পথটা একটু ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল।

তিন

বাড়ী ঢুকিয়া যশোদা দেখিতে পাইল, নন্দ আর সুবর্ণের বয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে ভিতরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়া আছে। অল্প দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে ধনঞ্জয়।

যশোদাকে দেখিয়া তিনজনেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলিল, 'এত শীগ্‌গির যে ফিরে এলে চাঁদের-মা ?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়া যশোদা পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'এরা কে ?'

'ওরা ঘর ভাড়া নিতে এসেছে। আমি বললাম এখানে ঘর ভাড়া মিলবে না—'

ছেলেটি বলিল, 'রাজেনদা' আমাদের বসতে বলে' গেছে। কাছেই বাড়ী না 'রাজেনদা'র ?'

যশোদা বলিল, 'হ্যাঁ, কাছেই বাড়ী।'

'রাজেনদা' বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসতে গেছে। আমরা থাকলে যদি আপনার অসুবিধে হয়—?'

পরিষ্কার ধবধবে জামা-কাপড় পরনে, সমস্তই সাদাসিদে সাধারণ, তবু দু'জনের পরিচ্ছদেই যেন মার্জ্জিত রুচি আর সহজ ও স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার ছাপ আঁকা রহিয়াছে। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশী হইবে না, মুখখানা মেয়েদের মত কোমল। মেয়েটির বয়স বোধ হয় ষোল বছর, এলোখোঁপায় আটকানো আঁচলটি খসিয়া পড়ি' পড়ি' করিয়াও পড়িতেছে না, সীঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা। মুখখানা সুশ্রী, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চপল দু'টি চোখ।

এতক্ষণ সে অবাক হইয়া যশোদার বিরাট দেহটি দেখিতেছিল,—জীবনে বোধ হয় সে এতবড় লম্বা-চওড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই। এবার ছেলেটির দিকে চাহিয়া অকারণেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি থামো। আমি বুঝিয়ে বলছি।'

তারপর সোজাসুজি যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটি বলিল, 'আমরা খারাপ লোক নই, আমাদের বিয়ে হয়েচে।'—

যশোদা বলিল, 'বিয়ে না হ'লে বুঝি লোক খারাপ হয়?'

মেয়েটি আবার ফিক্ করিয়া হাসিল, 'না, তা বলি নি। আপনি যদি কিছু সন্দেহ করেন, যদি ভাবেন আমরা পালিয়ে এসেছি বাড়ী থেকে, তাই জন্যে আগে থেকে বলে' রাখলাম। আমরা দু'জনেই ছেলেমানুষ তো? আমরা এমনিভাবে এসে ঘরভাড়া নিতে চাইলে আপনার কেন, সব্বারি মনে হতে পারে, ভেতরে কোন গোলমাল আছে নিশ্চয়। আপনিই বলুন, মনে হতে পারে না? গোলমাল অবিশ্যি আছে, তবে ও-ধরণের গোলমাল নয়। আমায় চুরি করার জন্যে ওঁর হাতে একদিন হাতকড়া পড়বে আর আপনাকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, সে ভয় করবেন না। গোলমালটা কি হয়েছে বলছি শুনুন। হয়েছে কি জানেন—'

মুখে যেন খই ফুটিতে থাকে মেয়েটির। যশোদা অবাক হইয়া শুনিয়া যায়। এতটুকু মেয়ে, বিবাহ নাকি হইয়াছে মোটে মাস ছয়েক আগে, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নি। কি তার মুখের ভঙ্গি, কি ভণিতা, কি ফোড়ন আর ব্যাখ্যা! শুনিতে শুনিতে যশোদার মনে হয়, কার যেন অনুকরণ করিতেছে মেয়েটি, হাত নাড়া, ঠোঁট নাড়া, চোখের পলক ফেলা,

রাগ দুঃখ ক্ষোভ বিস্ময় কৌতুক ফুটাইয়া তোলা আর মিলাইয়া দেওয়া, সব যেন তার নকল, কথাগুলি সমস্তই শোনা-কথার পুনরাবৃত্তি। কে জানে মা না মাসী না পিসী কে নিজেকে এমনভাবে উজাড় করিয়া মেয়েটির মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে!

গোলমালটা অসাধারণ কিছু নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। দাদার পছন্দ-করা একটি মেয়েকে বাতিল করিয়া অপছন্দ-করা এই মেয়েটিকে বিবাহ করায়, বিবাহে নগদ টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় এবং সম্প্রতি একটা কারখানায় পঁচিশ টাকায় প্রায় কুলি-মজুরের একটা কাজ নেওয়ায়, দাদা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। দাদার স্ত্রীর মতে, মায়ের পেটের ভাই তো দূরের কথা শত্রুও মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতা করে না।—

'আসলে, আমার জা-ই যত নষ্টের গোড়া। ক'দিন যা দেখেছি তাতেই বুঝেছি ভাসুর আমার লোক ভাল। আমায় দেখে ভাসুরের পছন্দ হয়েছিল, এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন উনি শুনেছেন; কিন্তু আমার জায়ের রংটা আমার চেয়ে একটু কম ফর্সা কিনা, আর দেখতেও আমার মত সুন্দর নয় কিনা—তা, তার এখন বয়েস হয়েছে; ছেলে-মেয়ে হয়েছে তিনটি, প্রথম বয়েসে যেমন ছিল এখনও কি তেমনি চেহারা থাকে, রূপ-যৌবন মানুষের দু'দিনে উবে যায়—আমায় দেখেই তাই অপছন্দ হলে গেল। তারপর যে মেয়েটিকে নিজে দেখে পছন্দ করল —ওগো, বলনা সে দেখতে কেমন ছিল? হাসছ যে? আমার খুব অহঙ্কার হয়েছে ভাবছ বুঝি? না বাপু, আমি ওসব অহঙ্কার বুঝি না, ন্যাকামি-পনার ধার ধারি না। সত্যি কথা বলব তাতে দোষ কি, তা সে নিজের

সম্বন্ধেই হোক আর যার সম্বন্ধেই হোক? আমি তো আর বলিনি, আমি আকাশের পরীর মত সুন্দরী! মোটামুটি দেখতে সুন্দর আমি, এই পর্য্যন্ত, বাস্। আমার মত সুন্দর মেয়ে গণ্ডা-গণ্ডা গড়াচ্ছে পথে-ঘাটে। তুমিই তো বলেছিলে, সে মেয়েটা দেখতে কালো আর চোখ একটু ট্যারা, বলনি? যাক্ গে, যা বলছিলাম, বলি। কি কথায় কি কথা এসে পড়ল। দেখুন তো দিদি, এমনি করে' পেছনে লাগলে কেউ কথা কইতে পারে? কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, সেই হ'ল আমার জায়ের রাগ। এমন ব্যবহার সুরু করলে আমাদের সঙ্গে কি বলব। নগদ টাকা সম্বন্ধে বলতে লাগল, উনি যে নগদ নেন্‌নি সে কি আর অম্‌নি অম্‌নি—নগদ নিলে টাকাটা আমার ভাসুরের হাতে পড়ত, এ বেশ বৌ এর গায়ে গয়না হ'ল। আমার পিসী,—পিসীই আমায় মানুষ করেছে, বড্ড ভালবাসে আমায়—পিসী নিজে থেকে আটশো টাকার গয়না বেশী দিয়ে দিল। গয়না যা দেবার কথা ছিল তাতো দিলই, তার উপরে আরও সাড়ে আটশো টাকার গয়না, নগদ টাকার বদ্‌লিতে। ভাসুর তিনশো টাকা মাইনে পান, ওক'টা টাকা নগদ পেলেই বা তিনি এমন কি বড়লোক হ'য়ে যেতেন, তিন মাসের মাইনেও নয়! কিন্তু জা' আমার ওই কথা বলে বলে ভাসুরের মন ভাঙাতে লাগল। তারপর ও যেই চাকরীটা নিল,—না নিয়েই বা কি করবে বলুন, ভাল একটা চাকরীও জুটিয়ে দেবে না, এদিকে ঘরে বসে' থাকার জন্যও খোঁচাবে! ভাসুর নয়, আমার জা'। হাত খরচের দু'চারটে পয়সা তো মানুষের লাগে? দাদার কাছে গিয়ে চাইলে তিনি বলবেন, আহা বৌদির কাছ থেকে নে না গিয়ে। বৌদির কাছে চাইলে

এমন করে' মুখ বাঁকাবে—! একবার দু'বার চেয়ে শেষে ও আর চাইত না। আমি একটা গয়না দিলাম বেচতে, তাও বেচবে না। এদিকে নস্যি কেনার একটা পয়সা নেই! তখন এই চাক্‌রীটা নিয়ে নিল। কিন্তু আমার জায়ের সে কি রাগ! বলে কি, লোকের কাছে দাদার মাথা হেঁট করাবার জন্যে ইচ্ছে করে' এই চাকরী নিয়েছে। নইলে এতগুলো পাশ ক'বে কেউ কুলি-মজুরের কাজ নেয়? খেটে খেলে লোকের কাছে মাথা হেঁট হবার কি আছে বলুন তো দিদি? রাত্তিরে আমার জা' কি সব পরামর্শ দিল কে জানে, সকালে আমার ভাসুর ওকে বললেন কি, হয় এ-কাজ ছেড়ে দাও, নয় আমার বাড়ী থেকে বেরোও। ফিক্ করিয়া সে আবার হাসিল, 'না, ঠিক ওমনিভাবে বলেন নি, তবে মোট কথাটা দাঁড়াল ওই। আমরাও তাই চলে এলাম।'

ছেলেটির নাম অজিত, মেয়েটির নাম সুব্রতা।

'তোমার ডাক নাম কি বোন? সুব্রতা বলে' ডাকতে পারব না।'

'আমার ডাক নাম নেই।'—সুব্রতা হাসে।

অজিত বলে, 'ওর ডাক নাম হ'ল গিয়ে—'

সুব্রতা চোখ পাকাইয়া বলে, 'ন্যাখো, ভাল হবে না কিন্তু!'

অজিত হাসিমুখেই চুপ করিয়া থাকে। তখন সুব্রতা বলে, 'আচ্ছা, বলো। কি আর হবে, আজ হোক কাল হোক জানতে তো পাবেন-ই!'

এই সামান্য হাসি-তামাসার ব্যাপারেও মনে হয়, অজিত যেন বৌ-এর বড় বাধ্য। সুব্রতার কৃত্রিম চোখ-পাকানো রাগকে পর্য্যন্ত সে

আদান করিয়া চলে। প্রথমটা যশোদার একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল, তারপর দু'একটা দিন যাইতে না যাইতে সে টের পাইয়াছে, এটা দু'জনের একটা ভালোবাসার খেলা মাত্র। দু'জনে বড় মজা পায় এ খেলায়। এই বয়সের দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে, মিলন যাদের হইয়াছে মোটে ছ'মাস আগে, এমন একটা আশ্চর্য্য মিল আছে মনের যে যেটুকু যশোদা বুঝিতে পারে তাতেই সে অবাক হইয়া যায়। সুব্রতা যদি আব্দার ধরে, আমায় আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও,—আদর দিলেই বৌরা সময় অসময়ে যে আব্দার ধরিয়া স্বামীদের মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়,—অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিচ্ছি পেড়ে। সুব্রতা জানে অজিত বুঝিবে এটা তার আব্দার, সুব্রতার এই জানা অজিত জানে, অজিতের এই জানাও সুব্রতা জানে, আবার সুব্রতার—দু'জনের জানাজানির এই প্রক্রিয়া যশোদার মনে হয় অন্তহীন আর রহস্যময়, তবু যেন দু'জনের মধ্যেই এর সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সহজ ও শান্ত আনন্দের গভীর অনুভূতিতে।

একেই কি বলে ভালবাসা ? মনের মিল ?

যশোদা ভাবে।

হিংসার মত কি যেন একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া জাগে যশোদার মনে, ক্ষীণ একটা অস্বস্তিবোধের পীড়ন চলিতে থাকে।

সুব্রতা তার ঘর সাজায়, সকালে আর সন্ধ্যায় অজিত তাকে সাহায্য করে। তিন টাকা ভাড়ায় যশোদা বড় ঘরখানাই তাদের দিয়াছে ; একটি তোরঙ্গ আর দুটি স্যুট্‌কেশে ঘরটা যেন খালিখালি দেখায়। সুব্রতা দেয়ালে টাঙায় ছবি আর ফটো, জানালায় দেয় পর্দ্দা, অজিতকে দিয়া আল্‌না আনায় আর বেশী-বেশী জামা-কাপড় অকারণে বাহির করিয়া

সাজাইয়া রাখে, যশোদার দেওয়া চৌকির পায়া চারটিতে রঙীন কাপড়ের ঢাকনি দেয়, টুকিটাকি আরো কত কি যে সে করে। আর সেই সঙ্গে করে অজিতের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ—যশোদার সামনেই। মাঝে মাঝে যশোদারও মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাস নয়, বছর নয়, সমস্ত ভবিষ্যতকে সে যেন এই একটি ঘরে আটক করিয়াছে। এই ঘরেই তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কোথায় টেবিল পাতিবে, কোন্‌দিকে আলমারি রাখিবে, ক'খানা আর কি ধরণের চেয়ার কিনিবে, এসব কল্পনার আর শেষ থাকে না। যে রেটে সে কল্পনায় আসবাব কিনিতে থাকে, তাতে একবছর পরে এ-ঘরে তিল ধারণের স্থান থাকিবে কি করিয়া যশোদা ভাবিয়া পায় না।

কয়েকদিন রাঁধিয়া খাওয়ায় যশোদাই। তারপর একদিন দুপুরে সুব্রতা বলে, 'আমি কোথায় রাঁধব দিদি ?'

'আমার রান্না রুচছে না ?'

'ওমা, সে কি কথা ! সত্যি বলছি দিদি, এমন রান্না জীবনে খাইনি কখনো। আজ যে কুমড়োর ছক্কা খাওয়ালে, ঠিক অমৃতের মত লাগলো। কুমড়োর ছক্কার যে আবার এমন স্বাদ হয়, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে কি জান দিদি, আমরা হলাম ভাড়াটে, চিরকাল তো আর তোমার ঘাড়ে খাওয়া উচিত হবে না।'

'আমার ঘাড়ে খাবে কেন বোন ? তোমরা খরচা দিও, রান্না এক জায়গাতেই হবে। চারটি তো প্রাণী আমরা বাড়ীতে, দু'যায়গায় রেঁধে কোন লাভ আছে ? মিছেমিছি বেশী খরচ।'

শুনিয়া সুব্রতা খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া যায়।

যশোদার প্রশংসা করিয়া বলে যে, বাস্তবিক, বয়স না হইলে কি এসব কথা মানুষের মাথায় আসে! কিন্তু একটা বিষয় আপত্তি করে সুব্রতা, সকাল সন্ধ্যায় চা-জলখাবার সম্বন্ধে।

'চা'টা কিন্তু আমি করব দিদি।'

'নিজের হাতে করে' খাওয়াতে চাও, না? বলিয়া যশোদা হাসে।

সুব্রতার সঙ্গে এমনিভাবে আলাপ করে যশোদা, কখনও মা মাসীর মত, কখনও সমবয়সী সখির মত। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পরেই সব গোলমাল হইয়া যায়, সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে সমবয়সী বন্ধু মনে হয় তাকে, আর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে খেয়াল হয় যে সে ষোলবছরের একটা কচি মেয়ে মাত্র, যে বয়সের মেয়ে যশোদারও থাকিতে পারিত।

এরা যে তার ভাড়াটে একথা যশোদার মনেই থাকিতে চায় না। দু'জনকে তার মনে হয় অতিথি, তার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; এদের খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করা আর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখার দায়িত্ব যেন তার।

পরদিন সকালে উনুনে আঁচ দিয়া যশোদা সুব্রতাকে ডাকিতে যায়। এ সময় রোজ সুব্রতা রান্নাঘরে উপস্থিত থাকে, আজ তাকে না দেখিয়া যশোদা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

ঘরে গিয়া যশোদা ছাখে কি, অজিত ছোট টুলটিতে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, চৌকিতে সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া গুটানো তোষকে মুখ গুঁজিয়া সুব্রতা কাঁদিতেছে।

'কি হ'ল সকাল বেলা তোমাদের?'

যশোদার সাড়া পাইয়াই সুব্রতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে। জলভরা চোখ, ভিজা গাল আর ফুলোনো ঠোঁটে কি ছেলেমানুষ আর সুন্দরই তাকে দেখায়! মনে হয় গিন্নিপনার অভ্যাসটাও যেন তার এখনকার মত ঘুচিয়া গিয়াছে। শিশুর মত যশোদার কাছে সে নালিশ জানায়।

'চায়েব জিনিষপত্র কিনবার পয়সা পর্য্যন্ত নেই দিদি। বললাম, এমনি মোটা-মোটা চুড়ি ছ'গাছা করে' কেউ একহাতে পরে না, দু'গাছা চুড়ি বেচে দিয়ে এস। তা, কিছুতেই বেচবে না। কি হয় বাড়্‌তি চুড়ি বেচলে?'

'চায়ের জিনিষপত্র কেনার জন্য বৌ-এর গয়না বেচব!'—অজিত বলে।

'কেন, বৌ কি পর?'—সুব্রতা বলে।

কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। বৌ-এর গয়না বেচার সমস্যা যশোদার আগের ভাড়াটেদের মধ্যেও অনেকবার দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমস্যাটা তখন দাঁড়াইত ঠিক উল্টা। গয়না বেচিতে স্বামীরাই ছিল উৎসুক, বৌয়েরা ছিল বিরোধী। কলহও ছিল তাদের ভিন্ন ধরণের, কথা কাটাকাটি ছিল যেন গালাগালি আর অভিশাপ, মারামারির ভূমিকার মত। দু'একটি স্বামী যে বৌকে চড়-চাপড়টা বসাইয়া দিত না, তাও নয়। অতীতে স্বামী-স্ত্রীর যত কলহে সে মধ্যস্থতা করিয়াছে তার সঙ্গে এই নব দম্পতীর কলহের পার্থক্যটা এত বেশী স্পষ্ট হইয়া যশোদার কাছে ধরা পড়ে যে, এদের মিল ঘটানোর লাগসই উপায় সে ভাবিয়া পায় না। মিলনের চেয়ে মধুর যে বিরোধ, তার কি প্রতিবিধান আছে?

একরকম জোর করিয়া রান্নাঘরে ধরিয়া নিয়া গিয়া দু'জনকে সে চা আর হালুয়া খাওয়ায়। মন কাঁদিতে থাকে নন্দ আর সুবর্ণের জন্য।

হয়তো এমনিভাবে কোথায় কার বাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া নিয়া তারা আছে, পয়সার টানাটানির জন্যই হয়তো তাদেরও প্রথম ঝগড়া বাধিয়াছে এমনিভাবে। প্রথম বয়সের উত্তেজনায় দুঃখকে বরণ করায় সুখ দু'দিনে ঘুচিয়া গিয়া দুর্দ্দশার দুজনের সীমা থাকিবে না, এই কথাই সর্ব্বদা সে ভাবে, কিন্তু আসলে হয়তো এদের মতই দুর্লভ আনন্দে দিনগুলি তাদেরও ভরিয়া আছে! ভাবিতে গিয়া সংশয় জাগে যশোদার। সুবর্ণ তো সুব্রতার মত নয়। সুব্রতার গিন্নিপণা আছে পাকামি নাই, লজ্জাহীনতা আছে বেহায়াপনা নাই, বুদ্ধি আছে কুটিলতা নাই, চপল হাসি মন ভুলানোর অস্ত্র নয় সুব্রতার। সুব্রতার মত সুবর্ণ কি কাউকে আপন করিতে পারে, সুব্রতার মত মনের মিল কি সুবর্ণের সঙ্গেও কারো হয়?

অজিতের চা খাওয়া দেখিতে দেখিতে যশোদার মনে হয়, কে জানে নন্দও তো অজিতের মত নয়। এদের দু'জনের মত নয় বলিয়াই হয়তো ওদের মধ্যে এদের মত মিল হইয়াছে।

যশোদার গম্ভীর মুখ দেখিয়া অজিত আর সুব্রতা ভাবে, তাদের চুড়ি বিক্রীর কথাটাই সে ভাবিতেছে। দু'জনেই যশোদার দিকে তাকায় আর চোখ নামাইয়া নেয়, তারপর প্রায় একসঙ্গেই পরস্পরের দিকে মুখ ফিরানোর ফলে যেই চোখোচোখি হয়, দু'জনের মুখেই মৃদু হাসি ফুটিয়া ওঠে। যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটা আজও তাদের চোখে অভ্যস্ত হইয়া যায় নাই, এখনো বিস্ময় আর কৌতুক জাগে।

হাসি দেখিয়া যশোদা বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তোমরা।'

দু'জনে ভাবে, এ বুঝি যশোদার শরীর দেখিয়া হাসার জন্য তিরস্কার।

লজ্জায় অজিতের চোখ মিট্‌মিট্‌ করে, সুব্রতার গাল দু'টী লাল হইয়া যায়।

যশোদা বলে, 'দুটো চুড়ি বেচবে কি বেচবে না, তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটা কেন? তেমন দরকার হ'লে গয়না বেচতে কোন দোষ নেই—বেচাই বরং উচিত। মেয়েমানুষের গয়না তো শুধু সখের সামগ্রী নয়, বিপদে আপদে কাজে লাগবে বলেই গয়না গড়ানো, ও হ'ল একধরণের সঞ্চয়। তাই বলে' যখন-তখন সামান্য কারণে বেচতে নেই। চায়ের জিনিষপত্র কেনার জন্যে কি আর গয়না বেচা চলে? তবে মনে কর সুবুর—'সুব্রতার একটা অসুখ বিসুখ হওয়ার কথাটা যশোদার জিভের ডগায় আসিয়া পড়িয়াছিল, সামলাইয়া নিয়া সে বলে, 'ছেলেপিলে হবে বলে' টাকার দরকার, তখন তো আর বৌ-এর গয়না বেচব না বললে চলবে না। আমার কাছে ধার নাও ক'টা টাকা, পরে শোধ করে' দিও।'

সুব্রতার মুখের লালিমা, আরও বেশী গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া থাকে।

অজিত বলে, 'টাকা ধার করতে কেমন যেন লাগে।'

যশোদা সুব্রতার মুখখানা দেখিতে দেখিতে বলে, 'সে তো ভালই। তবে দিদি বলে' যখন ডাকো আমায়, নিশ্চয় শোধ করে' দেবে জানো মনে মনে, তখন ক'টা দিনের জন্য আমার কাছে নিতে দোষ নেই।'

অজিত কাজে চলিয়া যায়। সুব্রতা রান্নাঘরে আসিয়া যশোদাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করিবার সুযোগ খোঁজে আর বার বার কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া যায়। রান্না প্রায় সবই হইয়া

গিয়াছে। সকাল সকাল রান্না শেষ করা যশোদার চিরদিনের অভ্যাস, ভাড়াটেরা তার ন'টার মধ্যে খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত। মাঝখানে বাড়ীতে যখন কেউ ছিল না, শুধু সে আর ধনঞ্জয়, তখন রান্না শেষ হইত। অনেক বেলায় অ‍ি ত আসিবার পর আবার যশোদা ন'টার মধ্যে সকালের রান্না শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল যে যশোদার বিশেষ লাগে তা নয়। মস্ত উনুনে কত লোকের রান্না সে একদিন রাঁধিত, বাড়ীতে দু'বেলা যেন চলিত নিমন্ত্রণের হাঙ্গামা, এখন শুধু সিদ্ধ করা চারজনের ভাত।

'জানো দিদি—'

কিন্তু যশোদাকে কথাটা সুব্রতার আব বলা হয় না। রাজেন আসিয়া বসিতে সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রাজেনের কাছে হঠাৎ তার এত লজ্জার কারণটা কেউ বুঝিতে পারে না।

'ভাড়াটেরা কেমন চাঁদের-মা ?'

'মন্দ কি !'

'আরেক জোড়া ভাড়াটে আছে, আনব ?'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'কেন, এক জোড়ায় কলঙ্ক ঠেকানো যাবে না ?'

রাজেনও হাসিয়া বলে, 'তা কেন, রোজগারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে ?'

'এদের মত ভদ্রলোক ভাড়াটে আনবে তো ?'

প্রশ্ন শুনিয়া রাজেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, এদের কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না চাঁদের-মা ? না তিনটাকা ভাড়ায় একখানা ঘর দিতে হয়েছে বলে' ভাবছ ? আমি কি সে সব না ভেবেই

তোমায় ভাড়াটে এনে দিয়েছি! ক'টা মাস অপেক্ষা কর, অজিতের মাইনে ডবল হয়ে যাবে,—তখন—'

যশোদা মাথা নাড়িয়া বলে, 'সেজন্য নয়। ভাবছি, শেষকালে কি ভদ্রলোক ভাড়াটেই শুধু রাখতে হবে আমায় যারা দু'চোখে কোনদিন দেখতে পারে নি?'

'আমি কিন্তু মানুষ চাঁদের-মা।'

'মানুষ না ঘোড়া তুমি তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক তুমি নও।'

'বি-এ ফেল করেছি, সাতষট্টি টাকায় চাকরী করা, বিয়ে করা, বৌ নিয়ে ঘর সংসার করছি—আমি যদি ভদ্রলোক নই, কে তবে ভদ্রলোক শুনি? সত্যপ্রিয়?'

'ও আবার একটা লোক নাকি যে ভদ্র হবে? ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ। চাদ্দিকে হু হু করে বাড়ী তুলে গণ্ডা-গণ্ডা ভদ্রলোক এসে বাসা বাঁধছে, ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়,—আর বলব?'

রাজেন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বলতে চাও বল, তবে আর শুনবার দরকার নেই। তোমার যখন ঝোঁক চাপে চাঁদের-মা—'

'মুখে খৈ ফুটতে থাকে, না?'

'ভদ্রলোকের ওপর তোমার এত রাগ কেন যশোদা?''

'ভদ্রলোকেরা কি মানুষ ?'

আরেক জোড়া ভাড়াটে আনিবার অনুমতি যশোদা দেয়। এক জোড়া যখন আসিয়াছে, আরও আসুক। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে যশোদার। মনে হয়, চলিতে চলিতে সামনে একটা বাধা পাইয়াছে বলিয়া নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য সে যেন বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুপুরবেলা কুমুদিনী আসিয়া বেড়াইয়া গেল, সুব্রতার সঙ্গে ভাবও করিয়া গেল। ইতিমধ্যে যতবার সে আসিয়াছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যশোদার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে, বসিতে বলিলেও বসে নাই। আজ প্রায় সমস্তটা দুপুর এ বাড়ীতে কাটাইয়া গেল।

সুব্রতার কি হইয়াছে কে জানে, সমস্ত দুপুর কুমুদিনী যে এত কথা বলিল তার সঙ্গে, কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে তার এতটুকু গিন্নিপনা দেখা গেল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হইতে লাগিল তাকে।

কুমুদিনী চলিয়া যাওয়ার পর আবার সে উস্‌খুস্‌ করিতে থাকে, সকালে রান্নাঘরে যেমন করিয়াছিল।

বলে, 'জানো দিদি, সেই যে বলছিলে না—?'

যশোদা বলে, 'কি বলছিলাম ?'

'সেই যে, যে জন্য গয়না বেচা চলে ?'

কিছুক্ষণ যশোদা বুঝিতেই পারে না, অবাক হইয়া সুব্রতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর খেয়াল হয়।

'ওমা, সত্যি ?' বলিয়া সুব্রতাকে সে বুকে টানিয়া নেয়।

কি হয় তখন যশোদার, প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত পরের একটা

মেয়েকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ? তীব্র বেদনার সম্ভাবনায় বিরাট দেহের প্রত্যেকটি অণু ভয়ার্ত্ত ঔৎসুক্যে সজাগ হইয়া ওঠে, চাঁদকে প্রসব করার সময় যেমন হইয়াছিল। আলিঙ্গনের চাপে দম আটকাইয়া সুব্রতার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। জোর তো সোজা নয় যশোদার দু'টি বাহুতে। সুব্রতার অস্ফুট আর্ত্তনাদে সচেতন হইয়া সে তাকে ছাড়িয়া দেয়। ধপ্ করিয়া মেঝেতে বসিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণস্বরে সুব্রতা বলে, 'আরেকটু হলেই শেষ করে দিয়েছিল দিদি।'

রাত্রে ধনঞ্জয়কে খাইতে দিয়া সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যশোদার মনে হয়, আরেকজন মানুষকে খবরটা শুনাইতে না পারিলে বুকট তার ফাটিয়া যাইবে।

'জানো, সুবুর ছেলেপিলে হবে।'

বাড়ীতে ভাড়াটে আসিবার পর ধনঞ্জয় কেমন মুষড়াইয়া গিয়াছে। ক'দিন চুপচাপ শুধু সকলকে দেখিয়া গিয়াছে, মুখে তার একটি কথা শোনা যায় নাই। যশোদার মুখে সুব্রতার সন্তান-সম্ভাবনার খবরটা শুনিয়া এবিষয়ে সে কিছুই বলে না, অভিমানী বালকের মত নিজের নালিশটা জানাইয়া বসে।

'রাজেনকে তুমি অত খাতির কর কেন চাদের-মা ?'

সুব্রতার নূতন খাপছাড়া অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখিয়া যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোথায় সে ছিল, কতদূরে বিভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে কোথায়। কিন্তু

ছোটবড় সব বিষয়ে অনেক ভুল করিলেও এবং নানারকম মুস্কিলে পড়িলেও কখনো তাকে কাবু হইতে দেখা গেল না। নিজেই ভুল সংশোধন করিতে লাগিল, মুস্কিলের আসান করিতে লাগিল। চায়ের সেট আর ওই ধরণের কয়েকটি অভাব মিটানোর জন্য সুব্রতার চুড়ি বিক্রী করার সমস্যা যশোদা সমাধান করিয়া দিয়াছিল। তবে সেটা সাময়িকভাবে কোনরকমে কাজ চালানো গোছের সমাধান। সে সমাধান গ্রহণ করার বদলে সুব্রতা নিজের সমস্যার আরও স্থায়ী ও ব্যাপক মীমাংসা করিয়া ফেলিল। যশোদার কাছে টাকা ধার করার বদলে দামী চায়ের সেটা কেনার মত প্রয়োজনগুলিকেই বাতিল করিয়া দিল!

হাসিমুখে বলিল, 'প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি দিদি কদ্দূর হিসেব করে চলতে হবে আমাকে।'

একটি এলুমিনামের কেটলী আর সস্তা কয়েকটি কাপডিস্ মাত্র কেনা হইল। আসবাব কিনিয়া ঘর বোঝাই করা তো বন্ধ হইয়া গেলই, যশোদাকে একদিন সুব্রতা জিজ্ঞাসাও করিল, বাড়তি কয়েকটা আসবাব বিক্রী করিয়া ফেলা যায় না?

খরচপত্রও সে হঠাৎ কমাইয়া ফেলিল। যুদ্ধের সম্ভাবনা টের পাওয়া মাত্র বুদ্ধি থাকিলে একটা দেশ যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, অদূর ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই বাধিবে জানিয়া সুব্রতাও যেন তেমনিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে।

সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই। তরুণ মনের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে কিন্তু দামও সে করিতে জানে। বাঁকা আলোয় চকচকে কাঁচকে হীরার মত খাতির করার খেলায় হয়তো সে আনন্দ পায়

এবং সে কাঁচের বিনিময়ে কিছু সোনাদানাও অনায়াসে দিয়া বসে কিন্তু হীরার বদলে কাঁচ পাইয়াছে বলিয়া কখনো আপশোষ করে না। কারণ, কাঁচ সে কাঁচ তা সে জানে, আসলে সে দাম দেয় শুধু আনন্দটুকুর।

যশোদা এটা আশা করে নাই। সুব্রতাকে ভাল লাগিলেও এবং একটু স্নেহ জাগিলেও প্রথমটা তাকে যশোদার মনে হইয়াছিল, তুবড়ির মত উচ্ছ্বাসভরা অকালে পাকা ফাজিল মেয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে যশোদা বুঝিতে পারিয়াছে, কথা বলা ছাড়া আর কোন বিষয়ে সে তুবড়ি-ধর্ম্মী নয়। ঠেকিয়া শেখা অভিজ্ঞতার পরিমাণটা তার অস্বাভাবিক রকমের বেশী নয়, কেবল দেখিয়া-শেখা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বভাবসিদ্ধ পটুতার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারটা বেশীরকম ভরিয়া ওঠায় তাকে একটু পাকা মনে হয়, আসলে মেয়েটা কাঁচাই আছে। মনকে সঙ্কীর্ণ করার অপরাধে নিজেকে অপরাধী করে নাই বলিয়া সাহস ও সরলতা তার একটু বেশী, তাই তাকে মনে হয় ফাজিল।

রাজেনকে যশোদা বলে, 'না, এরা ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'দেখলে তো? এমন ভাড়াটে এনে দিয়েছি, দু'দিনে পছন্দ হয়ে গেল। কি তোমার ভাল লাগে না লাগে, সব জানা আছে চাঁদের-মা!'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'মনের মানুষ তুমি, তুমি জানবে না তো কে জানবে?'

কাছে বসিয়া কুমুদিনী মুখ বাঁকায়। ধনঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সুব্রতার সুঠাম দেহ আর সুন্দর মুখখানা দেখিয়া একটা কথা যশোদার বার বার মনে পড়িয়া যায়। বাড়ীর লোকের পছন্দ করা কুরূপা মেয়েটির

বদলে তাকে বিবাহ করিয়া অজিত যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছে যশোদাকে প্রথমদিন তাই ব্যাখ্যা করিয়া শোনানোর সময় অজিতকে হাসিতে দেখিয়া সুব্রতা সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছিল, সে সুন্দরী বটে কিন্তু তার মত গণ্ডা-গণ্ডা সুন্দরী মেয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুব্রতার কথা আর ভঙ্গিকে তখন যশোদার মনে হইয়াছিল, একেলে মেয়ের পাকামির প্যাঁচ, ঘষামাজা ন্যাকামি। তারপর যশোদা জানিতে পারিয়াছে মেয়েদের পক্ষে এ বিশ্বাস পোষণ যতই বিস্ময়কর হোক, কথাটায় সুব্রতা সত্য সত্যই বিশ্বাস করে। তার মত রূপবতী মেয়ের পক্ষে নিজের রূপ সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা আন্তরিকতার সহিত পোষণ করা যে সম্ভব, এ অভিজ্ঞতা যশোদার ছিল না। রাম-লক্ষ্মণের মন ভুলানোর প্রতিযোগিতায় সীতা-উর্মিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এ বিশ্বাস যে সূর্পণখার ছিল, সে তো সে স্ত্রীজাতীয়া জীব বলিয়াই !

স্নেহ করার সঙ্গে সুব্রতাকে যশোদা তাই একটু শ্রদ্ধাও করিতে শিখিয়াছে।

চার

সুব্রতার চরিত্রের আরেকটা দিকও ক্রমে ক্রমে যশোদার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মেয়েটা খুব শিশুক।

যশোদা আর কুমুদিনীর সঙ্গে ভাব জমিয়াছিল একদিনে, পাড়ার কয়েকটি বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও সে ভাব জমাইয়া ফেলিল কয়েকদিনের মধ্যে। প্রথমে পরিচয় করিতে গেল সব চেয়ে কাছের বাড়ীর এবং সম্ভবতঃ ছোটখাট একটা পরিধির মধ্যে সবচেয়ে গরীব ও অতি-ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। পরিবারটি অমূল্য নামে একজন বছর পঞ্চাশেক বয়সের রোগজীর্ণ কেরাণী ভদ্রলোকের। যশোদার সঙ্গে এবাড়ীর মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও পরিচয় আছে অনেকদিনের। পরদিনই ওবাড়ীর সাত হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের আটজন মেয়ে যশোদার বাড়ী বেড়াইতে আসিল। সাত বছর বয়সের মেয়েটির রঙীন কাপড় পরার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, যৌবনে পা দিয়া তাড়াতাড়ি দলের তিনটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেন তার তর সহিতেছে না।

অনেকদিন আগে অমূল্যর বাড়ীর মেয়েরা দু'একবার যশোদার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। যশোদা তখনও কুলি-মজুরদের বাড়ীতে ভাড়াটে রাখিতে আরম্ভ করে নাই। তারপর নানা আপদে বিপদে মাঝে মাঝে যশোদাকে তারা ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু যশোদার বাড়ীতে কখনো আসে নাই। আজও তারা যশোদার কাছে আসে নাই, আসিয়াছে সুব্রতার নতুন সংসার দেখিতে।

অমূল্যর স্ত্রী আশাপূর্ণা পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'আমরা এলাম। কই, তোমার নতুন ভাড়াটে কই চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলিল, 'আমার নতুন ভাড়াটেকে খুঁজছ পাঁচুর মা ? এসো, বসবে এসো।'

আশাপূর্ণার পান চিবান বন্ধ হইয়া গেল। এতকাল কুলি-মজুরের সঙ্গে কারবার করিয়া প্রায় তাদের মত বনিয়া গিয়া এখনো তাকে সমানের মত সম্বোধন করার মত ভদ্রতা যশোদার আছে, সে তা কল্পনাও করে নাই।

কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যশোদার বাড়ীতে দুপুরবেলা রীতিমত মেয়েদের বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দু'একটি মেয়ে নয়, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, প্রফেসর, কেরাণী, জীবনবীমার এজেণ্ট প্রভৃতি অনেক রকম ভদ্রলোকের বাড়ীর অনেক মেয়ে। সকলের বাড়ী যে খুব কাছে তাও নয়। বড় রাস্তার ধারের কয়েকটি বাড়ীতে পর্য্যন্ত সুব্রতা তার পরিচয়ের অভিযান আগাইয়া নিয়া গিয়াছে।

হাসি-গল্প গান-বাজনায় যশোদার বাড়ী দুপুরবেলা মুখরিত হইয়া ওঠে। সুব্রতা মোটামুটি গান জানে, একটি হারমোনিয়াম আর একটি সেতার তার সঙ্গেই আসিয়াছিল। তারপর কয়েক জোড়া তাস আসিয়াছে, নগেন ডাক্তারের বাড়ীর ক্যারাম বোর্ডটি আসিয়াছে। একটি করিয়া মুখ আর পরচর্চ্চার মালমসলা তো সকলে সঙ্গে করিয়াই আনে।

একটা আড্ডা পাইয়া সকলেই খুসী। সুব্রতা যেন মেয়েদের একটা ছোটখাট ক্লাব সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজটা পাড়ার যে কোন বাড়ীর যে কোন মেয়ে ইচ্ছা করলেই করতে পারিত কিন্তু এতদিন কারও

খেয়ালও হয় নাই যে মাঝে মাঝে এ-বাড়ী ও-বাড়ী করার বদলে এক জায়গায় সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া পাড়াবেড়ানোর সাধ মিটাইবার এরকম একটা সহজ উপায় আছে। অবশ্য নিজের বাড়ীতে রোজ এতগুলি মেয়েমানুষের সমাগম সকলের পছন্দ হইত না। তবে একত্র হইতে চাহিলে কি আর স্থানের অভাব হয়!

প্রথম প্রথম কেউ আসিয়াছিল নিছক ভদ্রতার খাতিরে, কেউ মনের খেয়ালে, কেউ কৌতূহলের বশে। আসিবার আগে কেউ ভাবেও নাই যে, তাদের জন্য তাদের নিয়াই সুব্রতা যশোদার বাড়ীতে এমন একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে।

অল্পদিনে সুব্রতার নামহীন, উদ্দেশ্যহীন, কমিটি প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী-হীন মহিলা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। যশোদা রাগ করিবে কি খুসী হইবে বুঝিয়া উঠিবার সময়ও পাইল না। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার আগে নিজেই সে সঙ্ঘে যোগ দিয়া বসিল। নানাবয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রেণী বিভাগের জন্য সুব্রতাকে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইল, এটা হইল তার ফল।

'গরু আর বাছুর একসঙ্গে বসলে কি জমে দিদি?'

'না দিদি, জমে না।'

'কাল তাহলে আমি বিনু, উমি, সাবু এদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে যাব, তুমি বড়দের নিয়ে বসবার ঘরটাতে থাকবে, কেমন?'

সুব্রতা ভাড়া নিয়াছে একটি ঘর, কিন্তু মেয়েদের বসানোর জন্য আরেকটি ঘরকে বসিবার ঘরে পরিণত করিতে তার বাধে নাই। যশোদাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে নাই।

তারপর যশোদা বয়স্কাদের আসরে ভিড়িয়া গিয়াছে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ দু'য়ের মাঝামাঝি, কিন্তু সকলেই শিথিল। কেউ এখনো সচেতন গর্ব্বের সঙ্গেই ফর্সা চামড়ার স্তিমিত রূপের ঝাঁঝ বিকীর্ণ করিতেছে, রূপের অভাবে আসিয়া-যাওয়ায় বয়সটা পার হইয়া কেউ স্বস্তি বোধ করিতেছে। কারও গায়ে গয়না বেশী, কারও গায়ে কম গয়নার ফ্যাসন গয়নার চেয়ে স্পষ্ট। কারও মুখে পান, কারও মুখে ভাঙ্গা বাঁকা দাঁতগুলি রোজ সকালে কয়লার গুঁড়ার ঘষামাজা পায় বলিয়া বেশ সাদা।

কয়েকটি মুখ যশোদার অপরিচিত। চারিদিকে অনেক নতুন বাড়ী উঠিয়াছে, অনেক নতুন লোক সহরতলীতে বাস করিতে আসিয়াছে। সুব্রতা হয়তো এতদূর হইতে দু একজনকে টানিয়া আনিয়াছে, সহরতলীর পুরানো বাসিন্দা হইলেও যার মুখ চেনার সুযোগ যশোদার ঘটে নাই। চেনা হোক, অচেনা হোক, যশোদা এদের চেনে। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারের গিন্নি। কপালে থাকিলে যশোদা নিজেই হয়তো এতদিনে এদের মত একজন গিন্নি হইয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু কোথায় যশোদার চাঁদ? আত্মীয়-স্বজনভরা সংসার? সংসার না থাকিলে কি গিন্নি হওয়া চলে! মজুরদের নিয়া সে সংসার গড়িয়া গিন্নি হইয়া বসিয়াছিল, সত্যপ্রিয় সে সংসারও তার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

যশোদার দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ রাগ দ্বেষ হিংসা গ্লানি সব কিছুর উপর চিরদিন স্থায়ী একটা প্রলেপ থাকিত—মজা লাগার। জিভের ঘায়ে মধুমাখা মলমের প্রলেপের মত। সেই প্রলেপের অভাবে যশোদার মনের সবগুলি আঘাতের ক্ষত আজকাল কটকট করে।

যশোদার কিছুই করিবার নাই।

সর্ব্বদা পরের বিপদ ঘাড়ে করা, পরের সমস্যার মীমাংসা করা, বাঁচিয়া থাকার মর্ম্মান্তিক প্রচেষ্টায় আহত অনেকগুলি অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত বয়স্ক শিশুর সেবায় মসগুল থাকা, সব ঘুচিয়া গিয়াছে। রাজেন তাই তাকে শ্রমিক নেতার কাছে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, বাড়ীতে ভাড়াটে আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যা নিয়া যশোদা ছেলের শোক ভুলিয়াছিল, আত্মীয় পরিজনের অভাব ভুলিয়াছিল, নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পাইয়াছিল, এসব কৃত্রিম খেলনায় কি সে অভাব মেটে ?

অপরের দেখাইয়া দেওয়া আদর্শের দিকে অপরের সৃষ্টি কর্ম্মের নালায় জীবনস্রোতকে বহাইয়া দিবার সাধ যশোদার কোনদিন ছিল না। ওসব তার ধাতে সহ্য হয় না। সে যেমন আর তার যা আছে তেমনি থাকিয়া আর সেই সব নিয়া অনেকগুলি পছন্দসই পরের জীবনের ঘনিষ্ঠ আবেষ্টনীর মধ্যে সে নিজের নিয়মে বাঁচিতে চায়।

ভদ্রলোক নামে যে একশ্রেণীর মানুষ আছে তাদের পুত্রকন্যা প্রসব করিয়া আর সংসার চালাইয়া মাঝ বয়সেই যেসব গিন্নিদের দেহ, মন, মুখ, এমন কি শাড়ীর আঁচল আর ব্লাউজ সেমিজ পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাদের সঙ্গে কয়েকটা দুপুর আড্ডা দিয়াই যশোদার হাঁফ ধরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তার বদলে হঠাৎ সে যেন আহত মনের ক্ষতে মিষ্টি মলমের মৃদু একটা স্বাদ অনুভব করিতে লাগিল।

তার বাড়ীতে আসিয়া তার ঘরে বসিয়া একেবারে তার চোখের সামনে পাড়ার এতগুলি স্ত্রীলোক নিজেদের শ্যাওলা ধরা জীবন মেলিয়া

ঘরে আর উপেক্ষা, অবহেলা বা বিতৃষ্ণার বদলে যশোদার মনে জাগে মমতা। অজানা কিছু নয়, নতুন কিছু নয়। যশোদা এদের জানে, এদের জীবন যাত্রার পরিচয়ও রাখে। এদের দূরেও সে রাখিত সেই জন্যই। তবে দূরে রাখিয়া মোটামুটি ধারণা পোষণ করা এক কথা। একঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া অসংখ্য খুঁটিনাটি বিকৃতি আর ব্যর্থতা আবিষ্কার করিয়া মমতা বোধ করার সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য।

কেবল অসুখের সময় গিয়া সেবা করিযা, বিপদের সময় গিয়া সাহস দিয়া আর উৎসবের সময় গিয়া খাটিয়া আসিয়া যশোদা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এরাও মানুষ।

চাঁদ মরিয়া যাওয়ার পর সে যেমন ডাকছাড়িয়া কাঁদিয়াছিল, নগেন ডাক্তারের ফর্সা মোটা বৌ অতসী ছেলের শোকে তেমনিভাবে কাঁদিয়াছে।

অতসীর এখনো তিনটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে আছে। বড় ছেলে রমেন ডাক্তারি পড়ে। বড় ম্লান মুখখানা ছেলেটার, বড় বিষণ্ণ স্তিমিত দৃষ্টি। দেখিলেই যশোদার মনটা কেমন করিয়া ওঠে। ক'দিন আগে দুপুরবেলা কি দরকারে সে মাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তখন তার চোখে যশোদা যেন দেখিতে পাইয়াছিল, একটা চাপা-পড়া লাজুক ভাবপ্রবণ ক্ষুধা।

'বলগে যা, আসছি' বলিয়া ছেলেকে বিদায় দিয়া হাতের তাস নামাইয়া সকলের দিকে চাইয়া অতসী তৃপ্তির হাসি হাসিয়াছিল,—সগর্ব্বে। —'আর বছর ডাক্তারি পাশ করবে। এক বাড়ীতে দুজন ডাক্তার হবে, রুগীকে আর ফিরতে হবে না—একজন বাড়ী না থাক,

আরেকজন তো থাকবে, কি বলেন? পাশ করেই অবিশ্যি ওনার মত চার টাকা ফি করলে চলবে না, প্রথম দু'চার বছর দু'টাকা করে, তারপর পশার বাড়লে চার টাকা। উনি হয়তো তদ্দিনে আট টাকা ফি করে ফেলবেন, এখন থেকেই বলছেন, চার টাকায় আর পোষায় না—'

নন্দর কাছে রমেন কীর্ত্তন শিখিতে আসিত। তখনও তাকে দেখিয়া যশোদার মনে হইত, ডাক্তারি বিদ্যার চাপে ছেলেটা যেন দিন দিন কুঁকড়াইয়া যাইতেছে। দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু বৈষ্ণবের ছাঁচে ঢালিয়া মানুষ করিয়া ছেলেকে মড়া কাটিতে পাঠানোর জন্য অতসীর গর্ব্ব দেখিয়া একটা দুর্ব্বোধ্য বন্ধনের অনুভূতিতে যশোদাকে ব্যাকুলভাবে একবার জোরে শ্বাস টানিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর যশোদার মনে হইয়াছিল, কেবল রমেন তো নয়। সুন্দরী বড় মেয়েটাকে আই. সি. এস. বরের উপযোগী লেখাপড়া চালচলন শিখাইয়া তার চেয়ে অশিক্ষিত মাঝ বয়সী গেঁয়ো রাজার রাণী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেবল অতসীও তো নয়। একে একে অন্য গিন্নিদের ছেলেমেয়ের কথাও যশোদার মনে পড়িয়াছিল। মনে হইয়াছিল, যেন এক ধরণের জীবন যাপনের জন্য সকলেই যেন অন্য ধরণের জীবন যাপনের উপযোগী করিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করে।

যশোদা বড়ই মমতা বোধ করিয়াছিল। এদিক দিয়া কুলি-মজুরেরাও ভাল। আধমরা পশুর মত জীবন হোক, ছেলেমেয়েগুলি তাদের আধমরা পশুর মত জীবন যাপনের জন্যই জন্ম হইতে তৈরী হয়।

সুকুমার উকিলের স্ত্রী বনলতাও ফর্সা এবং মোটা। সর্ব্বদা পান খায়। সুযোগ পাওয়া মাত্র রোয়াকে দাঁড়াইয়া মুখভরা পান চিবাইতে চিবাইতে চুপি চুপি সে যশোদাকে বলে, 'চার টাকা না চারশো টাকা! যা মুখে আসে বললেই হল। পশার তো ভারি, সারাদিন হাঁ করে বসে থাকে রুগীর জন্য, একটা টাকা দিলেই ছুটে আসবে। চারটাকা কোথায় আদায় করে জানো চাঁদের-মা? অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় নেই, এদিকে রুগীর যায় যায় অবস্থা, তখন। আবার বলে আট টাকা করবে! এমন হাসি পায় মাগীর কথা শুনলে।'

হাসিবার জন্যই বোধ হয় যশোদার ঝকঝকে উঠানের একটা কোণ পিক ফেলিয়া ভাসাইয়া দেয়। তিন চার দিন আগে অতসী তার ডাক্তার স্বামীর ফির সম্পর্কে কথা বলিয়াছিল, যশোদার কাছে সে কথার ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আজ পর্য্যন্ত বনলতা সযত্নে কথাগুলি মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছে। এমনি চুপি চুপি আরও কত জনকে বলিয়াছে কে জানে, হয়তো আরও সপ্তাহখানেক ধরিয়া বলিয়াই চলিবে।

যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলার স্বভাবের জন্য একটা কড়া কথা বলিতে গিয়া যশোদা চুপ করিয়া গেল। হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, বনলতার মাথাটা যেন একটু খারাপ। বাড়ীতে যারা আসিতেছে তাদের সকলের মানসিক অবস্থাই কমবেশী অস্বাভাবিক, কিন্তু বনলতার মন যেন স্বাভাবিকতার স্তর পার হইয়া একটু বেশী রকম আগাইয়া গিয়াছে।

অতসীর সঙ্গে বনলতার খুব ভাব, তাস খেলার লড়াই-এ প্রায় রোজই তারা দু'জনে মিলিয়া একটি পক্ষ গঠন করে। বনলতা কথা বলে না

অনুরূপার সঙ্গে। অনুরূপা প্রফেসর সুনীল সেনের স্ত্রী। মানুষটা একটু হাবাগোবা ধরণের, বড়ই নিরীহ। যে যা বলে তাই সে মানিয়া নেয়, কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। এরকম গোবেচারা মানুষের সঙ্গে বনলতার কথা বন্ধ করার কারণটা যশোদা কোন মতেই ভাবিয়া পায় না।

এরকম খাপছাড়া যুক্তিহীন ব্যাপার যশোদাকে পীড়া দেয়। কতকটা নিজের বিরক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সে ভাবে, কারণ যাই থাক, দু'জনের মধ্যে ভাব করাইয়া দিলে দোষ কি ?

জিজ্ঞাসা করিতে বনলতা বলে, 'কথা বলব না কেন, বলি তো ?'

যশোদা বুঝিতে পারে অনুরূপার সঙ্গে সে যে কথা বলে না তাও বনলতা স্বীকার করিবে না, কথাও বলিবে না। এ চাল যশোদা জানে, তাই বনলতার সঙ্গে সময় নষ্ট না করিয়া সে ধীরে ধীরে অনুরূপার পাশে গিয়া বসে, বনলতা পিক ফেলিতে উঠিয়া গেলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'সেন গিন্নির সঙ্গে বুঝি আপনার বনে না ?'

অনুরূপা অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলে, 'বনবে না কেন, তবে কি জানেন—'

সুব্রতার ঘরে তখন মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ হইয়াছে। অনুরূপার মেয়ে অলকা চমৎকার গান গায়। বড় রাস্তার কাছাকাছি সামনে ছোট বাগানওয়ালা দোতলা বাড়ীটিতে তারা উঠিয়া আসিয়াছে বছর-খানেক আগে এবং আসিয়াই অলকা পাড়ার গায়িকাদের খ্যাতি ম্লান করিয়া দিয়াছে।

'আপনার মেয়ে বড় সুন্দর গান গায়' অনুরূপাকে এই কথা

বলিবার জন্য যশোদা মুখ খুলিয়াছে, পিক ফেলিয়া আসিয়া পানের পিকের মতই মুখ লাল করিয়া বনলতা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলে, 'ওই রে, ছুঁড়ি আবার গান ধরেছে! শুনছেন ? ফের প্যানপ্যানানি সুরু করেছে।'

অবিনাশ চাটুয্যের বৌ প্রভা মিনতি করিয়া বলে, 'আহা, একটু শুনতে দিন না ?'

বনলতা যেন ক্ষেপিয়া যায়।—'কি শুনবে ভাই ? ওকি গান নাকি ? মিন মিন করে কাঁদলেই যদি গান হ'ত—'

ইনস্যুরেন্স এজেণ্ট জগদীশের দ্বিতীয়পক্ষের বৌ অমলা হঠাৎ বলিয়া বসে, 'খুকুর চেয়ে তো ভাল গায়।'

বনলতা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে।—'খুকুর চেয়ে ভাল গায় ? এত বড় বড় ওস্তাদ রেখে খুকুকে গান শেখালাম, খুকুর চেয়ে ভাল গায় ?'

বনলতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়।

অতসী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে অমলাকে বলে, 'ওর পেছনে লাগবার কি দরকার ছিল আপনার ?'

এই সব গোলমালের মধ্যে ওঘরে গান বন্ধ হইয়া যায় এবং যশোদা এক গেলাস জল আনিয়া বনলতার তালুতে একটু একটু করিয়া থাপড়াইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনলতা শান্ত হইয়া উঠিয়া বসে।

যশোদা জানে এ শুধু ঈর্ষা আর অহঙ্কারের ব্যাপার নয়, নিজের মেয়ের চেয়ে অন্য একজনের মেয়ে ভাল গান গায় বলিয়া সুস্থ মানুষ এরকম করে না। ভিতরে বিকার আছে আর সেই বিকার এইরকম খাপছাড়া উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এ ধরণের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলি-মজুরদের বৌ-ঝি এ হিষ্টিরিয়ার ধার ধারে না। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়, এদের মত পচিতে সুরু করে না।

যশোদার চিন্তিতভাবকে সুব্রতার মনে হয় গাম্ভীর্য্য। সন্ধ্যার পর মন খারাপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ দিদি ?'

যশোদা প্রথমে বলে, 'ভাবছি ? কই, কিছুই তো ভাবছি না ভাই ?' তারপর বলে, 'ও, হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছি। মেয়েদের গান শেখাবার ইস্কুলের মত করলে হয় না একটা ? ঘরোয়া ইস্কুলের মত, মাইনে টাইনের দরকার নেই, দুপুরবেলা পাড়ার মেয়েরা এসে গান শিখে যাবে। যন্ত্র-পাতি কিনবার যদি দরকার হয় তখন বরং সকলের কাছ থেকে চাঁদার মত কিছু কিছু নিলেই হবে। কি বল '

প্রস্তাবটি শুনিয়াই সুব্রতা খুসী হইয়া ওঠে, 'নিশ্চয়, ঠিক্। আমিও ভাবছিলাম ওই রকম কিছু করতে হবে। বসে বসে শুধু গল্প করলে চলবে কেন ?'

'তুমি, অলকা আর খুকু গান শেখাবে।'

'অলকা আর খুকু ?' সুব্রতার মুখে দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, 'তবেই তো মুস্কিল !'

যশোদা হাসিয়া বলে, 'সে আমি ঠিক করে দেব।'

প্রথমে যশোদা গেল প্রফেসর সুনীল সেনের বাড়ী। অনুরূপা তার সব কথাতেই সায় দিয়া গেল, সব প্রস্তাবেই রাজী হইয়া গেল। কেবল অলকা একটু মুখ ভার করিয়া বলিল, 'খুকু আর আমি? ও মেয়েটা বড় হিংসুটে।'

কিন্তু যশোদার কাছে এতটুকু মেয়ে কেন মুখ ভার করিয়া থাকিতে পারিবে, বিশেষতঃ নিজের তাগিদে একটা করার ভার গ্রহণ করিয়া হঠাৎ যখন যশোদার শরীর মন হাল্কা মনে হইতে আরম্ভ করিয়াছে? অলকাকে জয় করিতে তার কয়েক মিনিট সময় মোটে লাগে। খুকু তো ঠিক হিংসুটে নয়, বোকা। তাছাড়া, অলকার গান শুনিয়া গান জানা কোন্ মেয়ের না হিংসা হয়?

'খুকুকে না ডাকলেও তো চলবে না দিদি! সারেগামা শেখানো, গলা সাধানো, সোজা গান শেখানো এসব তো একজনের করা চাই? এমন গান করো তুমি, তোমায় কি এসবের জন্ত বলতে পারি? তোমার সময়ই বা কই? মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দু'একখানা ভাল গান শেখাবে, বাস—!'

তেল মাখাইতেও যশোদা কম পটু নয়, গর্ব্বে আর আনন্দে অলকার মুখখানা তেল মাখানো মুখের মতই চকচক করিতে থাকে।

তখন যশোদা যায় বনলতার বাড়ী, মা ও মেয়েকে বুঝাইয়া বলে,—'আসলে খুকুই আমাদের গান শেখাবে, সব ভার থাকবে খুকুর ওপরে। অলকা মাঝে মাঝে আসে তো আসবে, দু'একখানা গান শিখিয়ে যাবে। মিহি গলা থাকলেই তো গান শেখানো যায় না, গান শেখাতে হলে সুর তাল শেখাতে হয়, নয় দিদি?'

খুকু গদগদ ভাবে বলে, 'আরও কত কি আছে—গান শেখা কি সহজ!'

একটি হারমোনিয়ম, একটি এস্রাজ আর পাঁচ ছ'টি ছাত্রী নিয়া যশোদার ঘরোয়া সঙ্গীত বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। সকলের যে খুব বেশী

উৎসাহ জাগিয়াছে তা নয়, সকলে ভাবিতেছে, যশোদার মতলবটা কি? কিন্তু যশোদা জানে বিনা পয়সায় মেয়েদের গান শেখানোর সুযোগ কেউ ছাড়িবে না, মেয়েদের গান বাজনার চর্চ্চা যারা পছন্দ করে না তারাও নয়। দু'চার দিনের মধ্যে ছোট বড় মেয়ের ভিড়ে তার ঘর ভরিয়া উঠিবে। এই তো সবে সুরু।

সকলেই আজ এক ঘরে। অন্য সকলে এলোমেলো ভাবে যে যেখানে পারে বসিয়াছে, একটি আস্ত পাটি কেবল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে গানের শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের। হারমোনিয়মের একদিকে বসিয়াছে ছাত্রীরা, অন্যদিকে পরস্পরের যতটা পারে তফাতে সরিয়া বসিয়াছে অলকা আর খুকু। কিন্তু এত কাছে বসিয়া, একই কাজ করিতে বসিয়া, পরামর্শ না করিয়া চুপ চাপ শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ সকলে যখন কি ভাবে গান শেখানো আরম্ভ হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তারা যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তাদের মায়েরাও বলে না, এটা তাই তখনকার মত তাদের ভুলিয়া যাইতে হয়।

প্রথমে অলকা বলে, 'কি শেখানো যায়? গান?'

তখন খুকু বলে, 'গলা কি করে সাধতে হয় শেখালে হতনা?'

অলকা বলে, 'গলা তো সাধবেই, একটা সোজাসুজি গান দিয়ে আরম্ভ করলে বোধ হয় ভাল হয়।'

খুকু বলে, 'একেবারে গান দিয়ে আরম্ভ করলে—'

পরামর্শের সুবিধার জন্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা পরস্পরের একটু কাছে সরিয়া আসে।

ছয় সাতটি নানা পর্দায় গলার বেমিল, বেসুরো, হঠাৎ-জাগা হঠাৎ-

খাসা আওয়াজে ঘরটা গম্ গম্ করিতে থাকিলে যশোদা বনলতা আর অনুরূপার মুখের দিকে তাকায়। এই দু'টি জননীর মধ্যে ভাব জমানোর যে তুচ্ছ খেয়াল হইতে এই সুরচর্চ্চার উৎপত্তি হইয়াছে, যশোদা তা ভোলে নাই। সুরচর্চ্চা অবশ্য যশোদা আর থামিতে দিবে না, আরও ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চর্চ্চা করাইবে, কিন্তু ওদের দু'জনের ভাব হওয়াটা তো দরকার ?

হঠাৎ যশোদা উঠিয়া যায়, ঘরের এক প্রান্ত হইতে হাত ধরিয়া অনুরূপাকে অন্যপ্রান্তে বনলতার কাছে টানিয়া আনে, বনলতার পাশে তাকে বসাইয়া দু'জনের হাতে হাত মিলাইয়া দিয়া আবেগ কম্পিত গলায় বলে, 'আপনাদের দু'টি মেয়েই রত্ন। ওদের জন্যই আমার সাধ মিটল। ওরা যদি আমার মেয়ে হত !'

বনলতা প্রায় কাঁদিয়া ফেলে।—'কত ওস্তাদ রেখে কত চেষ্টায় মেয়েকে আমি গান শিখিয়েছি !'

অনুরূপা বলে, 'আপনার মেয়ে সত্যি শেখার মত করেই শিখেছে।'

বনলতা কাঁদিয়া ফেলে।—'ওর গলাটা যদি তোমার মেয়ের মত মিষ্টি হ'ত ভাই।'

তিন মাসের মধ্যে পথের ওদিকে এবাড়ীর মুখোমুখি যশোদার অন্য বাড়ীতে একটি রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। বাড়ীর সামনে ছোট একটি কাঠের ফলকে নামটা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়াও হইল। বাড়ীটি যশোদা কোনদিন আর ভাড়া দিবে না ঠিক করিয়াছিল। তবে ভাড়া দেওয়া আর কাজে লাগানোর মধ্যে তফাৎ আছে।

বনলতা একদিন চুপি চুপি যশোদাকে বলে, 'স্কুল তো দিব্যি চলছে চাঁদের-মা। খুকু তো প্রাণ দিয়ে খাটছে তোমার স্কুলের জন্য, এবার ওর জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দাও?' বনলতা পান চিবাইতে চিবাইতে হাসে, 'মাইনের কথা বলছি না, অত খাটছে মেয়েটা, হাত খরচ বাবদ কিছু—'তারপর হঠাৎ হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বলে, 'ওস্তাদ রেখে গান শেখাতে জলের মত টাকা ঢেলেছি কিনা, তাই বলছি।'

তবু যশোদা ভুল করে না যে বনলতার মাথা আসলে সকলের চেয়ে বেশী খারাপ নয়।

পাঁচ

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়ের মনের মত নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মত তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এই আপশোষ মাঝে-মাঝে মানুষটাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড় বড় উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কি তাই নিয়া গবেষণা করে, আর তার ছেলে আর জামাই এমন! না জানি লোকে কি ভাবে? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দেয় কিনা?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়ের খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কি রঙ্ জামাইয়ের! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয় কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনো সত্যপ্রিয়ের কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না, সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না, সম্বন্ধ ঠিক করার সময় সে একবার বলিয়াছিল, 'আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে হ'ত না?'

সত্যপ্রিয় মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন?'

'কি জান, তোমার মেয়েকে যদি ছেলেটির পছন্দ না হয় ? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে, টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানায়নি ভেবে মনটা হয়তো খুঁত খুঁত করবে।'

'সবাই কি তোমার মত ভাবপ্রবণ ভাই !'

'তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বৈকি। টাকা দিয়ে গরীবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনের মিল হবে ? আর মনের মিল যদি না হ'ল—'

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়ীতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মত স্পর্দ্ধা কখনও তার হইতে পারে ! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া সে তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর তার চোখের সামনে চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস উদাস চাহনি হইয়াছে মেয়ের।

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মত শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারী জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ীর কারো সঙ্গে কখনো তর্ক করে না। বৌ-এর সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড় লোকের জামাই হইয়া হাতে অনেক টাকা পাইয়াও বাহিরে স্ফূর্ত্তি করার দিকে তার একটুকু টান দেখা যায় না।

তবে ? যোগমায়া মাঝে-মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে কেন ?

নিরুপায় আপশোষে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তা' মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত, কিংবা অন্য কোন স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখের জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোন প্যাঁচ পর্য্যন্ত খাটানোর উপায় নাই! যামিনীর হাতখরচের টাকাটা কোন ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে ? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশী।

তা ছাড়া সমস্যা তো ওরকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া ?

একদিন যামিনীর একটু জ্বর হইয়াছে, সামান্য সর্দ্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়ের পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপারে তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তার ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল।

ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারের বাড়ী যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়ই অসাধারণ মনে হইল। ভাবিয়া-

চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর এমন কোন অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি লাগে, যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন? এভাবে সে তো কখনো কোথাও যায় না!

ডাক্তারের বাড়ী দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়ীতে তাকে নিয়া যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দ্দিজ্বরের টস্‌টসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড় ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোট রঙ্‌-চটা বাড়ীতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের? পুরানো একটা ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ ছ'খানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রঙ-করা চটের পার্টিসন দেওয়া, তার ওপাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবতঃ প্রতীক্ষা করিতেছিল, সত্যপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইল না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'আসুন, আসুন, বসুন।'

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নীচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, 'আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পরে আবার আসবেন। যা-যা বললাম করবেন আর ওষুধ দু'টো নিয়ম মতো খাবেন।'

'রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু?'

যুবকটির গলা খুব মোটা আর কর্কশ কিন্তু কি যে গভীর হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভঙ্গিতে! রাত্রির ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকাল বেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিল, 'হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবার আসবেন।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার রাত্রে ঘুম হয় না?'

অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখের পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়ের মুখের দিকে একনজর তাকাইয়াই চোখ নীচু করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটলে তো এরকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি করে আত্মহত্যা করছে! তাদেরি বা দোষ কি, সব শিক্ষার দোষ। মা বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সামলে চলবে! কি বলেন ডাক্তারবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি।'

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তারবাবু।' বুঝা গেল, পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'বোসো একটু, তোমার ঘুমের জন্য একটা কথা বলে দিই। ওষুধের চেয়ে এতে তোমার বেশী কাজ হবে। শোয়ার আগে

এক কাজ করবে, মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেরুদণ্ড সিধা করে' বসবে। এইখানে তোমার নাভিপদ্ম আছে জানো বোধ হয়? এখানে বাঁ হাত দিয়ে এই ভাবে আস্তে স্পর্শ করে' থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে? ডান হাতটি এই ভাবে মাথার তালুতে রাখবে। তারপর চোখ বন্ধ করে' ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে' নিও, কেউ যেন ঘরে না আসে। আর—'

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাই-বোন শোয়, আমার বাপ-মা'ও ওঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।'

'অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে' নিও।'

'আরেকটা ঘরে দাদা-বৌদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।'

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, একরকম পলাইয়া গেল। এই অবহেলাতেই সত্যপ্রিয় জ্বালা বোধ করে সব চেয়ে বেশী। কেউ শুনিতে চায় না, তার এত দামী দামী কথাগুলি সাধ করিয়া কেউ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে চায় না। না শুনিয়া যাদের উপায় নাই শুধু তারা শোনে, অন্য সকলে পালানোর জন্য ছটফট করে। এত হাল্কা মানুষের মন? ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।'

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, 'নিশ্চয়। ওদের কথা আর বলবেন না।'

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিসনের ওপাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া

আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আসিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তুমি গাড়ীতে বোসো গিয়ে যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে' আসছি।'

যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরীব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়ের পরিচিত মস্ত নাম-করা কবিরাজ। যামিনীর জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজী বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেকরকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা হইল।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল, কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তার মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগমায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিরাজ ঘাড় নাড়িল।

'ভালর চেয়ে তাতে মন্দই বেশী হবে মনে হয়।'

কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব, এ-যুগের চিকিৎসকেরা কি জানে? জানিলেও সত্যপ্রিয়ের চেয়ে তো বেশী জানে না!

'ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কি ফল হবে কব্‌রেজ মশায়?'

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বামী-স্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাৎ করলেই কি ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায়? ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, 'তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামায়ের কোন চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন-কিছু খারাপ নয়! ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে!'

'তা বলতে কি বুঝাচ্ছেন?'

'বুঝাচ্ছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্থ, কোন আঘাতটাঘাত পেয়েছে মনে কিংবা অনেকদিন থেকে কোন দুঃখকষ্ট সহ্য করে' আসছে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করে' খুব হৈ-চৈ ফূর্ত্তি করে' দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।'

'হৈ-চৈ ফূর্ত্তিটা কি রকম?'

'এই মনের আনন্দে থাকা আর কি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসিতামাসা করা, খেলা-ধূলা ভাল লাগলে তাই করা, দেশটেশ বেড়ানো, ভাল লাগলে শিকার-টিকারে যাওয়া—কি জানেন, সবাইকার তো এক জিনিষ পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায় যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশী বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্পবিস্তর অসংযমও ভাল। শ্রীমান বড় বেশী ভয়ে-ভাবনায় দিন কাটায়—'

'কিসের ভয় ভাবনা?'

সত্যপ্রিয়ের মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কি!

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিন পরেই সত্যপ্রিয় মেয়েকে দেশে পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়ের এক পিসতুতো বোন স্বামীপুত্র নিয়া অনেকদিন হইতে এখানে

আছে, হঠাৎ তার দেশে গিয়া বাস করার সখ চাপিল। সত্যপ্রিয়ের ইঙ্গিতে অনেকের মনে অনেকরকম সখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়ের, তখন সে মুখ ভার করিয়া বলে, 'না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'ক'দিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি ক'রে না। মেয়ে-জামাইকে দেশের আত্মীয়স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়ের হইয়া থাকে, সে তো ভাল কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতেই সে রাজী আছে।

'দুশো টাকা দেবে বাবা আমায়?'

'বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস্!—কি করবি টাকা দিয়ে?'

'নতুন রকম একটা গয়না কিনব। আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।'

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে—সব মেয়েরই কমে। বিবাহের পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুসী মেজাজেই মেলামেশা করে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কি ভাবে গড়িয়া উঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে, যামিনী সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না, তার যাইতে ইচ্ছা

করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভাল নয় তার। কি হইয়াছে? এই গা ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানের এ রকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়ের জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতমত খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, 'কি করব দাদা, যাব! মায়া তো কিছুতে যেতে রাজি নয়। যামিনীব এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।'

'তোমাদের সকলের মাথায় গোবর ভরা।'

নিজের দোষটা বুঝিতে না পারিলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পরে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'যামিনী।'

যামিনী বলে, 'আজ্ঞে?'

'তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জীবনে উন্নতি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক'মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ করে' আসতে পারবে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বৈকি।'

ক্ষুব্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভাল। শ্বেত পাথরের মেঝেতেই দু'জনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নীচু করিয়া উসখুস্ করিতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

'কবে যেতে হবে ?'

'কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়মমত ওষুধপত্র খেয়ো। কব্‌রেজ মশায়কে বলে' দেব, তাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল-সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—'

আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা খুবই ধারালো, হঠাৎ তার মনে হয় জামায়ের সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

'কত টাকা ?'

'পাঁচশো।'

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে-ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু সত্যপ্রিয়ের মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবীটা যেন কতকটা সেই ধরণের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে মাসে দু'শ টাকা দেওয়া হয়। খরচ তার কি যে দুশো টাকাতেও কুলায় না ? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাঁচশো টাকার একটা চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলি মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছটাছুটি

করিতে করিতে হঠাৎ যেন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লী রওনা হইয়া যায় আর অতদূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ করিতে পাঠানোর জন্য বাপেব ওপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ীর সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ কবিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, সকলে কি অকৃতজ্ঞ! যার ভালর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া প্রথমটা সত্যপ্রিয় কথাটা বিশ্বাস করিতেই চায় না।

'কা'র ছেলে হবে?'

'মায়ায়। এই চার মাস।'

সংবাদটা এমন খাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মত আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভুল হয়নি তো তোমাদের?'

দিল্লীর সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিনমাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দ্দেশপত্র পাঠানোব কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরো অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরী করিয়াছে, এমন অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যেদিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারো কাছে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং

নিজের সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বে গর্ব্বই অনুভব করিয়াছি। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড় একটা ভুল করার জন্ম সঙ্কোচ বোধ না করার ক্ষমতা সেও নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না।

ছি, কি কদর্য্য ভুল!

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনের পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে শ'তিনেক টাকা চাইল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।'

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আব্দার করিয়া বলিল, 'আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা?'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।'

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ নাকি কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত একবার ধারে-কাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বুঝা গেল, দু'জনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশো টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার

নিয়াছিল, যতদিন পারে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়ের কাছে আসিয়াছে।

'কোটিপতি মানুষ আপনি, আপনার ছেলের নামে এ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করব? আমি কি পাগল? আমি জানি আপনার কাছে এসে দাঁড়ালেই টাকা পাওয়া যাবে। দু'মাস ছ'মাস অপেক্ষা করব তাতে আর কথা কি? তবে কি জানেন, হঠাৎ বড় দরকার পড়ে গেল টাকাটার —আজকের মধ্যে না পেলে নয়।'

পরদিন কোর্টে নালিশ রুজু না করিলে দেনাটা তামাদি হইয়া যাইবে।

সত্যপ্রিয় নীরবে একটা চেক লিখিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয় ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্য কথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়ের সত্যই তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার কাজেই শুধু লাগে, মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এরকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরীব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন করিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভাল, মনটা তার নিশ্চয় নরম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণেই তার মেয়েকে হয় তো সে কষ্ট দেয় না। যামিনী যে বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করে সম্প্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে, তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই

হোক আর যে ভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, খুব বেশী অন্যায় বলিয়াও গণ্য করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা সকলেই টাকা টাকা করিয়া পাগল। তাই নিয়ম সংসারে। কেবল নিজের মেয়ে জামায়ের ব্যাপার বলিয়াই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারীর সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড় রকমের ব্যাপার আছে, সোজাসুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমন কি রীতিমত ভাল ব্যবহার করিয়াও যে একজন আরেকজনকে অবহেলা করিতে পারে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাৎ অনেক, সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। পুরুষমানুষ যদি অকারণে মেয়েমানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেয়েমানুষের সুখের জন্য কি দরকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন আজকাল নানা দিক দিয়া নানাভাবে আসিয়া তাকে ক্রমাগত আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তে সে খেয়ালেও করিত না, কিন্তু এদিকে এখন তার মন গিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং না চাইলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্যার মত, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশী যন্ত্রণা বোধ হয় এই ভাবিয়া যে সে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে সে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে সুখী হয় নাই।

ব্যবসার একটি সমস্তার মত ব্যাপারটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি সমাধান আবিষ্কার করিয়া ফেলে। ব্যাপারটা তো মূলতঃ এই। মেয়েকে সুখী করার ভার সে জামাই-এর উপর ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সেজন্ত খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করাব দায়িত্বটা জামাই-এর। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্ম্মচারী আর এজেণ্টের ভোঁতা মাথায় এই জ্ঞানটুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, 'বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা বড় খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে। তা তুমি এক কাজ কর, ক'দিন বাপমা'র কাছে থেকে এসো গে। আজকেই চলে' যাও, এইবেলা, এইমাত্র—জিনিষপত্র থাক্।'

যামিনী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, 'আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—'

'পথের খরচ বাবদ এই চারটাকা দিলাম—গাড়ীভাড়া তিনটাকা চোদ্দ পয়সা, নয়? মন সুস্থ না করে মানে, মনের অবস্থা না বদ্‌লে এসো না।'

এক ঘণ্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিতে গেলে সকলের মাথা

ঘুরিয়া যায়। তাও কি সম্ভব? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকলে ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোন কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোন উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়ের অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু কাজটা কি? কি উদ্দেশ্য সত্যপ্রিয়ের?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যামিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায় কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজি?'

'আজ্ঞে না, ঠিকমত—'

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এ অপদার্থের কাছে কি আশা করা যায়! সত্যপ্রিয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়।

'বুঝতে পারলে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বৈকি, নিশ্চয়।'

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া গিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েকদিন পরেই সে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামায়ের কাছে এরকম কবিত্বপূর্ণ পত্র লেখা সত্যপ্রিয়ের মত মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়ের পত্রের মর্ম্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে: অন্ততঃ যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

চার

যশোদা ভাবিয়াছিল, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্যই চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ী দু'টিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণীর নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দু'বেলা কুড়ি-বাইশ জনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু'চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ওভাবে ছাড়া এসব মানুষের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিক ভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়ীতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে স তখন এ কথাটা কল্পনাও করিতে পারে নাই। চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়াছিল, এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অভাবে আর চাপে খানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সব সময় যশোদার মনটা তখন হু-হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তার সংস্পর্শে আসিলে বিপদ ঘটিবে জানিয়া, সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে। ওদের ভালবাসি-বার ভাণ করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনের সাহায্য করে, ওদের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করায়, ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে!

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কোন ব্যাপারকে ব্যক্তিগত কল্পনার বাষ্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্টই আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু'দণ্ড সুখদুঃখের গল্প করিলে সকলে যে কৃতার্থ বোধ করিত, এ কি কৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়ীতে থাকিলে কাজ থাকে না, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জ্জন করিবার, ওদের তখন আর কি করিবার ছিল?

এসব কথা যশোদা ভাবিয়াছে। কিন্তু মন তার অবুঝ হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই আর মানিতে চায় না। সুবর্ণকে নিয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশী কাবু করিয়া দিয়াছে।

নিজেকে যশোদার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে আর জোর পায় না। যুক্তিতর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিয়াছে তা নয়, সেও একরকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়র মিলের কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিয়াছে নিছক দু'দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড় একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুসী করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি চাই?'

কি চাই অর্দ্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, 'আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন?'

মনটা যশোদার সত্যিই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ একটু আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়ীতে তার কুলি-মজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে দু'বেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের প্ররোচনায় বাড়ীতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে-আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ীর চারিদিকের সহরতলীতে, তাতে কুলি-মজুরদের এখানে আর বাস করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকের সহুরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়া কুলি-মজুরদের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ টিকিয়া গেল।

একদিন রাজেন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ করিবে। কেন আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কি, কি করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টাখানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন্ দেশী আলাপ? একেবারে যেন অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া বাজে গল্পে আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতেই যশোদা কয়েকবার রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শুনা গেল না।

'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া রাজেন ফিরিয়া আসিল।

'কেমন লাগল লোকটিকে চাদের-মা?'

'তা যেমনি লাগুক, আগে বলত শুনি মানুষটা কে?'

'খুব নাম-করা লোক গো—বিধুবাবু।'

বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ী আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার!

'বিধুবাবু! বিধুবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন?'

রাজেনের চেয়ে সে-কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া

আলগোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, 'তাহ'লে পশু'র সভাতে যাচ্ছ তো দিদি?'

আগের দিন বিধুবাবু তাকে 'তুমি'ও বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কিসের সভা?'

বিধুবাবু আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন, রাজেন বলেনি?'

'কই, না?'

সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবুর হাসির শব্দে যশোদার বাড়ী সবগরম হইয়া উঠিল।—'তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে! আমি কে তাতো বলেছে, না তাও বলে নি?'

'প্রথমে বলে নি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।'

যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথমদিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নাম-ধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভাল লাগিতে থাকে। এরকম লোকই ভাল, যারা অকারণে প্রথম পরিচয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়-বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড় প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

দু'দিন পরে শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্ম্মীদের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ, করিয়া নিয়া যাইতে চায়, ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার যদি ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর

ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

'সমিতি-টমিতির সঙ্গে কি আমার বনবে বিধুবাবু? সমিতির লোকেরা আমার ওপর চটে' আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে।'

'ওসব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভাল করবে তা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজি হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা শুনলেন কার কাছে? রাজেন বলেছে বুঝি?'

বিধুবাবু বলিল, 'সত্যপ্রিয় মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক রকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হ'ল, এ তো বড় খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বললে বসে' বসে' মরচে ধরায় বড় নাকি কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয় মিল বড় করেছে জানো?'

'শুনেছি।'

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড় ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে এটুকু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়া

আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার, প্রতিক্রিয়া যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাপ্রবণতা গোড়া শুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া যায়। সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যে ভাবে বিদুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পরিণতির প্রমাণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আরেক জন লোক এভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে যারা কৌতুক বোধ করে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময়ও একজনকে খাপছাড়া মুখের ভঙ্গি করিতে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এরকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা যায়। এদের আর যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্ত বেশী মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারেই ভাবে না।

সেদিন খাওয়ার সময় সুব্রতা বলিল, 'আমরাও আজ এক জাগায় যাচ্ছি দিদি।'

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খবরটা দেওয়ার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।

'আমায় নিয়ে যাবে না?'

'তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে?'

'ও, তাই আজ তোমরা সিনেমায় যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার সুযোগ পেয়ে!'

বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্ত পরিহাসে

এত জোরে হাসিবার কি ছিল সেই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মত হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থামিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনের গাড়ীতে তারা সিনেমায় যাইবে, এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া একজন মস্ত বড়োলোক থাকে, তার ছেলের গাড়ীতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন্ স্কুলে পড়িয়াছিল, হঠাৎ ক'দিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বৌকে নিয়া আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে।

পাকা গিন্নীর মত মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, 'আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার সখ আছে দিদি? কি করব, বন্ধু বড় ধরেছে। ও কি বলছিল জানো দিদি? বন্ধুর বাপ নাকি বৌকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া দু'চোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে যায়। সেকেলে ভূত আর কি। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে ক'দিনের জন্য, ছেলেও বৌকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটারবুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে সেকেলে, গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়ই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্য্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায়, মমতাও হয়। রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে মহীতোষ চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়ীতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, আফিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার

বড় খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, গালাগালি দেয়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে সতীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু সতীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদার বাড়ীতে থাকে? যশোদার বাড়ীর ভাড়াটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার সাহস সে পাইল কোথায়?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুসী হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খারাপও তার লাগিল না। পরিচালক সমিতির সভায় বড় বেশী তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্ত অনেকে বড় ব্যস্ত। বড় বড় কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এরকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মত পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তারপর হঠাৎ কখন কি ভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল আর দুর্ব্বোধ্য হইয়া গেল কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সেজন্ত এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির।

এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মত ঠেক্‌নো দিয়া দশবিশজন শ্রমিককে কোন রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিক-

তন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভাল বাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া ছাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভাল লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোন বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কারো দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতার, কিন্তু এরকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই হয়তো সহজ ও সম্ভব?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় ন'টার সময় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়ের প্রকাণ্ড গাড়ী। ভিতরে একা বসিয়া আছে একটি অল্পবয়সী বৌ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বৌটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'চাঁদের মা, ও চাঁদের মা, শুনুন।'

বৌটি কে এবং এখানে গাড়ীর মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোশের বৌ বলিল, 'ওঁকে একটু শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের-মা'?

'তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কি বলে' নেমে গেলে বাছা ?'

'কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।'

বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনো কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দু'জনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরী হইল না। ছেলেমানুষ তিনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধিটা সত্যই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কি, এদিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ীর মত, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কি সে মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বৌটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে ?

যশোদাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, 'কেমন আছেন চাঁদের-মা ? আজ এঁদের নিয়ে—'

'একা বসে' থাকতে বৌমার ভয় করছে।'

'আঁ ? ও, হ্যাঁ, যাই।'

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশোদার বিছানা দখল করিয়া শুইয়া আছে।

'তুমি এখানে যে ?'

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

'ভাত খেয়েছ!'

'খেয়েছি।'

সারাদিন রাগে গজ গজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল, কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়ীতে নিজে রাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না।

বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, 'এখানে এসো না, আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম?'

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, 'ওঁর ঠক্ ঠক্ করে' হাঁটা দেখলে এমন লাগে আমার! কি হ'ল দিদি তোমার ওখানে?'

'কি আর হবে, কুলি-মজুরের মিটিং হ'ল। তোমরা কেমন বায়স্কোপ দেখলে বল।'

বায়স্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বৌ-এর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী বলিতে আর দু'জনের সমালোচনা করিতে সুব্রতার বেশী আগ্রহ দেখা গেল, ওদের কথাতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থামিতে পারে না। আঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল, 'দেখবে দিদি বইটা? নাম-টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।'

সহরতলী

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উল্টাইতেছিল। এক পাতায় দু'জন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল।

নন্দ আর সুবর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে?

সুব্রতা বলিল, 'কি হ'ল দিদি? কার ফটো দেখেছ?—ওঃ, ওই ছেলেটার! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা কি বলব তোমায়!'

পাঁচ

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়-রকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা' নাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়, চার টাকা পথ খরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সেইরকম একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমাদের স্বাধীন কর বলাটাই এ ধরণের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা। যামিনাও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে দাবী করিয়া বসিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

'ভিন্ন থাকবে? মেসে?

'আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ী নিয়ে—'

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষী রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটু হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, 'আমার তো আর বাড়ী নেই বাবা, এই একটা ছাড়া?'

'ছোটোখাটো একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।'

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'বেশ তো, সেজন্য ব্যস্ত হবার কি আছে! কিছুদিন যাক না!

যামিনী একগুঁয়ের মত বলিল, 'আজ্ঞে না, দু'চার দিনের মধ্যে একটা বাড়ী ঠিক করে চলে যাব ভাবছিলাম।'

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমত গম্ভীর হইয়া গেল।

'দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবে ভাবছিলে? তা বেশ। একটা বাড়ী দেখে নাও, কলকাতায় বাড়ীর অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ী না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকলেই সুবিধে হ'ত না?'

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে একা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার কথা সে ভাবিতেছে না, সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'আমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এই কথা বলছ তো? মাসে মাসে বাড়ী ভাড়াটাও দিতে হবে নিশ্চয়?'

'আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—'

'কিসের মাইনে? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দু'শো টাকা হাত খরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু? কাজকর্ম্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার, এখন আমার পকেট থেকে যে হাত খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে,—বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার।'

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে সে গেল যশোদার বাড়ী।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথ খরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন ধারাল নয় যে ঘরের কোন কোন খবর যে বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাওয়া উচিত এটুকু তার খেয়াল থাকিবে।

সত্যপ্রিয়ের মনের কোন কথা কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরে টের পায় না, মহীতোষের মনের কথাগুলি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হইয়া যায়, তারপর তার প্রস্তাব শুনিয়া যশোদার একেবারে চমক লাগে।

'আমার এখানে থাকবেন মানে কি গো জামাইবাবু?'

অজিত বুদ্ধিমানের মতো একটু তফাতে সরিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীরভাবে বলিল 'শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের-মা? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মতো আপনার এখানে ঘর ভাড়া করে থাকব।'

'একা?'

'উঁহুঁ, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মতো।'

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে নিয়া যামিনী তার বাড়ীতে ঘরভাড়া করিয়া থাকিবে! এমন ছেলেমানুষী কথা যশোদা জীবনে কখনো শোনে নাই।

'ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরের সঙ্গে?'

'ঠিক ঝগড়া নয়, ওখানে আর বাস করা যায় না। কি কুক্ষণেই যে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের-মা!'

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্য্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, ফেণাইয়া ফাঁপাইয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অবিরাম সে বড়লোকের, বিশেষ করিয়া সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে বিবাহ করার ট্র্যাজেডি বর্ণনা করিয়া যায়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না. সত্যপ্রিয়কে সে তো

চেনেই, যামিনীর মত ছেলেরাও তার অজানা নয়! অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্ত্রীক যামিনীকে বাড়ীতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশীদিন বড়লোক শ্বশুরকে অবহেলা করিয়া শ্বশুরবাড়ীর আরাম ছাড়িয়া এখানে বাস করিয়া থাকিবার মানুষও যামিনী নয়, তার বড়লোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। সত্যপ্রিয়ের কাছ হইতে একবার ডাক আসিলেই দু'জনে ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নরম করার জন্য দু'দিনের জন্য এ বিদ্রোহ।

তবু দু'দিনের জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এই জন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা ?

তাছাড়া আর কি বলা চলে! মুখোমুখি দু'টি বাড়ীতে পচিশ ত্রিশটি মানুষ নিয়া যশোদার ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে জ্বালাতন করার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়!

ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়া স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই। যামিনী বাড়ী বহিয়া আসিয়া প্রতিশোধের এরকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়ে-জামাইকে এভাবে বাড়ীতে রাখিলে সত্যপ্রিয়ের ধনসম্পদ নষ্ট হইবে না, হাত-পাও ভাঙ্গিবে না। হয়তো শুধু সহ্য করিতে হইবে

নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সেটা কিছুই নয়।

'উনি কি মেয়েকে ছেড়ে দেবেন আপনার সঙ্গে?'

'উনি ছেড়ে না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।'

'মেয়েকে চুরি করবেন!' বলিয়া যশোদা হাসে!

যশোদা তামাসা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে চুরি করিবে, অথবা সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়ের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে? সত্যপ্রিয়কে আগে হইতে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ী ছাড়া সহজ ব্যাপার নয়, যদিও সে মেয়ে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা করে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ী থাকে না। পর পর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মন স্থির করিতে পারে। গরীবের মতো কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, সেটা তার কাছে একটা কাল্পনিক উত্তেজনাময় নতুনত্ব মাত্র, যশোদার বাড়ীতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। কলিকাতায় এত বাড়ী থাকিতে যশোদার বাড়ীতে কেন? তাছাড়া বাপের বাড়ীর এত কাছে যশোদার বাড়ীতে থাকাটা কি উচিত হইবে, না, ভাল দেখাইবে? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড় বড় আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়ীতে বাস করিতে যোগমায়াকে যামিনী যদি বা রাজি করাইতে পারে, চুপি চুপি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজি হয় না।

'কেন, আমি কি পাপ করছি? স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে যাব, তা লুকিয়ে চুরিয়ে যাব কেন ?'

যোগমায়া এখনো স্বামীর ঘর করিতে যায় নাই, সে অভিজ্ঞতাও তার নাই। সে শুধু শুনিয়াছে, স্বামীর ঘর করিতে যাওয়াটা মেয়েদের মহা গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা।

'বাবা যেতে দেবেন না।'

'খুব দেবেন।'

আসল কথা, যোগমায়ারও সখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নতুনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মত এতবড় বাগান-ঘেরা বাড়ী ঘরভরা গাদা গাদা আপনজন আর আত্মীয়স্বজন, এত সব দামী আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হৈ চৈ, কর্ত্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্ত্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে।

বিবাহের অনেক আগে হইতেই একঘেয়ে লাগে, বাড়ীর বাহিরে খেলা করিতে যাওয়া সত্যপ্রিয় যখন রদ করিয়া দিয়াছিল। বিবাহ হইলে ভাল লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে রাত কাটাইতে ভাল লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষের মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রব -বিহীন অল্পবয়সী একটি মেয়ের মন ?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথ-খরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে! স্বামীর

সঙ্গে ভাঙা ঘরে সে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়ীতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে একদিন সত্যই হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ গুজগাজের শেষ রহিল না। সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগমায়া বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়ের অনুমতি চাহিতে যাওয়ার সময় কেউ তার সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা-যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিল। আর দু'একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই।

খবরটা দিতে আসিয়াছিল তার ভগ্নীপতি, খবর দিয়া আফশোষের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা বিপদ হ'ল তো !'

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য্য হওয়ার ভাণ করিয়া বলিয়াছিল, 'কিসের বিপদ ?'

তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই ? সত্যপ্রিয়ও লড়াই করতে জানে।

দুরু দুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া ছাখে, সত্যপ্রিয় মেঝেতে

যোগাসনে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কি ভাবে কথাটা বলা যায়? কি ভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম? মাথা ঘুরিয়া, গা কাঁপিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কি ভাবে যে শেষ পর্য্যন্ত কথাটা বলিয়া বসে নিজেই ঠিকমত বুঝিতে পারে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, 'যামিনী নিয়ে যাবে? আচ্ছা। কবে যাবি?'

যোগমায়া বলে, 'আজ।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'বেশ।'

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনো তাকে পাঠাইতে রাজি হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আর সে তখন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্মেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করিলে! তার বদলে, একি! এক কথায় তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিল? এখন তো আর না গিয়ে উপায় থাকবে না।

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আর আসতে দেবে না।'

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, 'বেশ তো।'

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করে, 'কি উপায় হবে এখন ?'

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া বলে, 'ভালই তো হ'ল।'

'ছাই হ'ল ! তোমার মাথা হ'ল !'

যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, 'আমি যাব না।'

রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে ক'দিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষী তাই এখন ভয়ানক বিপদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে !

'যাবে না মানে ?'

'না না, যাব না। কোথায় যাব আমি বাবাকে ছেড়ে ?'

যামিনী আহত হইয়া বলিল, 'বেশ। যাওয়া ঠিক করে এখন উল্টো গাইছ।'

'তুমিই তো কুপরামর্শ দিয়ে মাথা ঘুলিয়ে দিলে আমার ?'

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়ে যোগমায়া বলে, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'আমাদের আবার কষ্ট কিসের !'

যোগমায়া থমকিয়া যায়। সামলাইয়া উঠিয়া আবার বলে, 'আমি জানি তোমার ইচ্ছে নেই বাবা, তোমার মনে ব্যথা দিয়ে—'

নিজে না গলিলে এজগতে কারও ক্ষমতা নেই সত্যপ্রিয়কে গলায়। তেমনি স্নেহহীন কণ্ঠে নির্ব্বিকার ভাবে সে বলে, 'আমার মনে ব্যথা দিবি কেন?'

বাপের ব্যবহারে মর্ম্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভাল, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভাল।

তবু, কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া সে বলে, 'তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল বাবা—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'তোরা দু'জনেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্, মাথায় চড়ে' গেছিস্ দু'জনে।'

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়ীতে গিয়া উঠিল। রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়ীতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিয়া করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ী ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয়? মেয়েকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মন কেমন করিয়া উঠিলে যে যদি একটু নত হইয়া যামিনীকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া শান্ত করিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেয়?

আগে পরে দু'জনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, 'সাবধানে থেকো' আর যোগমায়াকে বলিল, 'সাবধানে থাকিস্।'

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ী। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব

মেয়েরা যশোদার বাড়ীতে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়ীটি কোনদিন ছাখে নাই। ভিতরে ঢুকিয়া সেও যেদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে নাকি? খাটপালঙ্ক, আলমারী, ড্রেসিংটেবল্ এ-সব না থাক, কিন্তু একি দেয়াল, একি মেঝে, একি দরজা জানালা! কতটুকু ঘর!

সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিল, 'যাক্, এ্যাদ্দিনে একজন মনের মত সঙ্গী জুটল। তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই!'

'তুমি আমার ভাইকে চেনো?'

'চিনি না? কবে থেকে চিনি।'

'কি করে চিনলে?'

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মত সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়ই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া গেল।

'ওঁর সঙ্গে পরিচয় আছে। তোমার দাদা ওঁর বন্ধু।

'তাই নাকি? তাতো জানতাম না।'

যশোদা যোগমায়াকে দেখায়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া সে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

'আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু?'

'কেন চাঁদের-মা?'

'দু'দিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এসময় টানা-হ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভাল রাখার জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয় নি আপনার?'

যামিনী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'এখনো দেরী আছে।'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ছাই আছে। ও দু'চার মাস সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরী থাকলেই বা কি, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে?'

যশোদার বড় অনুতাপ হয়। সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া খুসী হওয়ার সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এরকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের মনে এই ধরণের হাঙ্গামার ব্যাপার কি রকম আঘাত দিতে পারে সেটা অনুমান করা তো তার পক্ষে কঠিন ছিল না। মানুষকে হিংসা করিলে এমনি হয়, একজনকে হিংসা করিতে গিয়া মনেও থাকে না আরও অনেকে তার ফলভোগ করিবে।

কি আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভাল করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসি-তামাসা করে, গম্ভীরমুখে বলে, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দু'দিন বাদে বাপ যখন গাড়ী পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা?'

'বাবা আর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদাদিদি।' যোগমায়া কাতরভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'থামো বাছা তুমি। বাপ কখনো মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে?'

'আমার বাবার ভীষণ রাগ, তুমি জানো না। চলে আসতে যখন দিয়েছে, কখ্খনো আর ফিরে যেতে দেবে না।'

'দেবে—আমি বলছি দেবে। বাপ-মার রাগ ক'দিন টেঁকে? দু'দিন বাদে রাগ জল হয়ে গেলে যখন মন কেমন করতে আরম্ভ করবে, নিজে এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের।'

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করে, 'রাগারাগি করে এসেছে বুঝি?'

যশোদা বলে, 'কিসের রাগারাগি? সংসারে অমন কথা কাটাকাটি হয়।'

যামিনী ও সত্যপ্রিয়ের কলহের ব্যাপারটাই যশোদা একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। যামিনী শ্বশুরের সঙ্গে আর সত্যপ্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে যেন একটু ছেলেখেলা করিতেছে, যশোদার ভাবটা এই রকম। যোগমায়াকে সাহস দেওয়ার জন্য এটা শুধু যশোদার ছলনা নয়। সত্যপ্রিকে সে জানে। পুতুল কথা না শুনিলে ছোটছেলে যেমন তার অত সাধের পুতুলটি ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, সত্যপ্রিয়ও তেমনি তার অবাধ্য প্রিয়জনকে পিষিয়া ফেলিতে পারে অনায়াসেই। তবু যশোদা বিশ্বাস করিতে পারে না সত্যপ্রিয় মেয়েকে ফিরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া বেশীদিন চুপ করিয়া থাকিবে।

যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেক দিন আগে, যশোদার বাড়ীতে যখন শুধু কুলি-মজুরের অস্তানা ছিল,

আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবী করার জন্ম যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। 'আজ যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে, দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঘরটা গুছিয়ে নাও ?' যশোদা বলে।

'আমার কি হবে যশোদাদিদি !' যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বলিয়া সব দেখিতেছিল, এক ফাঁকে চুপিচুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলে, 'না।'

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনান ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু।

'ঘুমোচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। এই তো ঘুমোলো চারটের সময়।'

যশোদা তা জানিত।

'খুব কেঁদেছে, না ?'

'শুধু কান্না ! কি বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের-মা।'

যশোদা তাও জানিত। একটা আফ্‌শোষের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'একটা বড় দেখে বাড়ী ঠিক করে' উঠে যাব চাঁদের-মা ?'

যামিনীর কাছে শ'খানেক টাকা আছে, যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আব বাক্সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'বড় বাড়ী দিয়ে কি হবে ? ক'টা দিন যাক।'

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়ের কোন আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়ে-জামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে থাকে, যশোদা না থাকিলে ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভস্ ব্রেকডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানা ভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে, কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায় ? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে মানুষের ?

যশোদা যখন বলে, 'এরকম যদি করবে, এলে কেন ?'

যোগমায়া বলে, 'আমি আসিনি, আমায় জোর করে এনেছে।'

যামিনী যখন বলে, 'এমন জানলে তোমায় আমি আনতাম না।'

যোগমায়া বলে, 'আমাকে মেরে ফেলে বাবাকে কষ্ট দেবে বলে তুমি আমায় জোর করে এনেছ।'

'চলো তবে তোমায় রেখে আসি ?'

'বাবা না ডাকলে কি করে যাব ?'

শুধু এই একটি বিষয়ে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের মতই তার তেজ দেখা যায়। অথবা সত্যপ্রিয়ের মেয়ে বলিয়াই হয়তো সে হিসাব করে যে না ডাকিতে ফিরিয়া গেলে ভবিষ্যতে প্রায় চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখানোর সুবিধা থাকিবে না।

সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়ীতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেল সিনেমায়, যশোদার বাড়ীর মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটা পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।

যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম।—'দাদা ! দাদা এসেছো ! তুমি কোত্থেকে এলে দাদা ? বাবা পাঠিয়েছে ?'

মহীতোষ নিষ্ঠুরের মত নির্ব্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাবা পাঠাবেন বৈকি ! কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ করে' দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন !'

যোগমায়া দমিয়া গেল।—'বারণ করে' দিয়েছেন !'

'করবেন না ? যা কীর্ত্তিটাই তোমরা করলে !'

যশোদা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, 'আহা, কেন মিছে ঘাবড়ে দিচ্ছেন ওদের ? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—ও রাগ কি টেঁকে ? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, 'তা যাবে—তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বৈকি।'

'অন্ত সবাই বলে না আমার কথা ?'

'বলে বৈকি।'

'কি বলে বলো না দাদা ?'

'নিন্দে করে, আবার কি বলবে।'

শুনিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিন্দা করিবে বৈকি, স্পর্দ্ধা কি কম সকলের! করুক, যত পারে নিন্দা করুক। ফিরিয়া গিয়া নিন্দা করার মজাটা সকলকে সে যদি টের না পাওয়াইয়া দেয়—

যোগমায়ার মন যতই খারাপ থাক আর বাড়ীঘরের অবস্থার জন্ত যতই লম্বা করিয়া কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়ী, এখানকার কুঁড়ে ঘরেও তারই তো সংসার। মহীতোষকে যে কি দিয়া অভ্যর্থনা আর আদর-যত্ন করিবে সে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করে। ক'দিন আর সে বাড়ী ছাড়িয়াছে, ক'দিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়া গিয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, 'স াই ভাল আছে, সব ঠিক আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস ?'

যেমন ছিল সব তেমনি আছে ? সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই ? একটু কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ ? যোগমায়া দুঃখে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশী বিব্রত হইয়া কয়েক মিনিট বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে।

যোগমায়া কান্না থামাইয়া আবদার জানায়: 'রোজ একবার করে' এসো কিন্তু দাদা।'

'আসব।'

'আর শোন বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার কথা—'

'বাবা কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এসেছিলাম জানতে পেরে আমায় না খেয়ে ফেলে।'

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে? মেয়ে-জামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়ের দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কেন যশোদা করিয়াছিল, যশোদা নিজেই জানে না। মেয়ে-জামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে গুম্ খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম্ খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়ে-জামাই তার যশোদার বাড়ী ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুম্ড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্ব্বনাশ। কি ভাবে সত্যপ্রিয়ের পক্ষে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়ের মগজে ওরকম অনেক মতলব ঠাসা থাকে, সাধারণ মানুষের কাছে যা দুর্ব্বোধ্য কল্পনাতীত।

কিন্তু আগে মেয়ে-জামাই-এর একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়ে-জামাই-এর ভাল-মন্দের কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়ে-জামাইকেই হয়তো যশোদাকে জব্দ করার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই!

যশোদার মনটা খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে

লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল ? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষে ? আদর্শবাদের ব্যাপারটা যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজবুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোন উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া গেল বীভৎস রকমের। তার রকম-সকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া গেল। কোন বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড় অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একেবারে সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলার মত মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'কি মন খারাপ করে আছি আমরা সবাই মিছিমিছি! বাড়ীতে যেন মড়া জমেছে ক'গণ্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্ত্তি করি আজ। কি করা যায় বল তো ?'

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে ?'

সিনেমা-থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্ত্তি করার আর কোন উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, 'তাই চল।'

সহরতলীতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দ্দায় দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই-যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণ ব্যাকুলতাকে যশোদা বড় ভয় করে। নন্দকে পর্দ্দায় নড়িয়া চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া

দিয়াছিল। সাধ করিয়া ওরকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কি—ও তো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার সামিল!

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, 'সেই ছবিটা দেখতে যাব—সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বল্লে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায়?'

সুব্রতা বলিল, 'সেটা তো আমি দেখেছি। একটা নতুন ছবি হচ্ছে, খুব ভাল বই, সেটা দেখবে চল।'

যশোদা বলিল, 'না, ওই ছবিটা দেখব। এক ছবি দু'বার দেখলে তুমি মরবে না। ইচ্ছে না হয়, যেও না।'

ছয়

সকলে সিনেমায় গেল দল বাঁধিয়া। যশোদার বাড়ীতে যারা বাস করিতেছিল তারা তো গেলই, বাহির হতে আসিয়া যোগ দিল কুমুদিনী আর কেদার।

যোগমায়া শেষ মুহূর্তে হঠাৎ বাকিয়া বসিয়াছিল।

সকলে তখন সাজগোজ করিয়াছে, কেদার আর কুমুদিনীও আসিয়া হাজির হইয়াছে। যশোদার সিনেমায় যাওয়ার উপযুক্ত বেশভূষা করা নিয়া একটু হাঙ্গামা বাধিয়াছিল—সেরকম কাপড় কই, ব্লাউজ কই? সুব্রতা যাচিয়া যশোদাকে কাপড আর ব্লাউজ ধার দিতে গিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'আমার এই কাপড়টা পরো না দিদি, আর এই ব্লাউজটা।'

অনেক দিনের পুরোনো তোরঙ্গ ঘাটিতে ঘাটিতে যশোদা বলিয়াছিল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার জামা আমার হাতে ঢুকবে কিনা সন্দেহ, গায়ে দেব!'

'আচ্ছা, কাপড়টা পরো তা'হলে।'

'না দিদি, আমার যা আছে তাই ভাল।'

সুব্রতার মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

'জানো দিদি, তোমার এই স্বভাবের জন্ত তোমায় কেউ দেখতে পারে না।'

চওড়া পাড় পরিষ্কার একখানা সাদা শাড়ী পরিয়া যশোদা নিজেই

একটু হাসিয়াছিল।—'রঙিন কাপড় পরার বয়েস কি আর আছে বোন? তোমার এমনি সাদাসিদে কাপড় থাকলে পরতাম। তোমার ঐ কাপড় পরে বৌ সাজি, আর আমায় দেখে সং ভেবে সবাই হাসুক, অত বোকা তোমার দিদিকে পাওনি।'

'রঙীন কাপড় পরলে লোকে হাসবে, এত বুড়ী তুমি হওনি দিদি। তোমার বয়েসে সবাই সাজগোজ করে।'

জামাকাপড়ের এই আলোচনায় বোধ হয় যোগমায়ার খেয়াল হইয়াছিল, একে একে সে চাহিয়া দেখিয়াছিল সকলের দিকে। তারপর চাহিয়াছিল নিজের জমকাল শাড়ীখানার দিকে। এদের সঙ্গে সে সিনেমা দেখিতে যাইবে, এদের সঙ্গিনী হিসাবে? কি ভাবিবে লোকে? চেনা লোকে যদি তাকে এদের সঙ্গে দেখতে পায়? এ পাড়াটা পার হইয়া যাওয়ার সময় তো অনেক চেনা লোকের চোখে পড়িয়া যাইবে, সত্যপ্রিয় চক্রবর্ত্তীর মেয়ে সে, কে না তাকে চেনে এপাড়ায়?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া যোগমায়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে রওনা হওয়ার সময়েও তাকে ঘরের বাহির হইতে না দেখিয়া সুব্রতা ডাকিতে গেল।

যোগমায়া বলিল, 'আমি যাব না, যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

'কেন? হঠাৎ তোমার কি হল, যাবার জন্য তৈরী হয়ে?

'বললাম তো ইচ্ছে করছে না।'

সুব্রতা মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, 'ও যাবে না দিদি। কাপড়চোপড় ছেড়ে বসে' আছে।'

তখন ব্যাপার বুঝিতে গেল যশোদা।

মুখ ভার করিয়া যোগমায়া চৌকিতে বসিয়া আছে, বিনা দোষে কে যেন তাকে তিরস্কার করিয়াছে অনেক।

'কি হ'ল হঠাৎ, যাবেনা কেন?'

'ভাল লাগছে না যশোদা দিদি।'

যশোদা একটু হাসিল, বলিল, 'সেজেগুজে রওনা হওয়ার সময় হঠাৎ এরকম ভাল না লাগা তো ভাল কথা নয়। চলো, লোকে কিছু ভাববে না। যদি ভাবে তো ভাববে যে, আমরা তোমার চাকর-দাসী—তুমি কোথাকার রাজরাণীটাণী হবে, পাঁচ-সাতজন চাকর-দাসী নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছো।

যোগমায়া চোখও তোলে নাই, আর কথাও বলে নাই।

যশোদা গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না? সাদাসিদে একখানা কাপড় প'রে চলো, এ কাপড়টা তোলা থাক। আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে—মনের খুঁতখুঁতানিটা যদি চাপতে পার কোনরকমে, কি ফুর্ত্তিটা হবে বলতো?'

পাশে বসিয়া যোগমায়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নতুন কিছু একটা করেই গ্যাখোনা আমার কথায়—খেলা মনে করে করে গ্যাখো একবার? সখ করে!'

সাদাসিদে একখানা শাড়ী পরিয়াই শেষে যোগমায়া দলে ভিড়িয়াছিল। সকলেই হাসিখুসী, অল্পবিস্তর উত্তেজিত—উত্তেজনা ছাড়া তো আনন্দ হয় না। কেবল যোগমায়ার উত্তেজনার মধ্যে আনন্দ নাই, যশোদার হুকুমে সে সকলের সঙ্গে আসিয়াছে কিন্তু মন কেন খুসী হওয়ার হুকুম মানিবে?

টিকিট আগেই করা ছিল, সকলে ভিতরে গিয়া বসিল। আরম্ভ হইতে তখনও আধঘণ্টার উপরে দেরী। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। অজিত আর যামিনী নিয়মিত সিনেমা ছাখে, তারা ছাড়া, এ আধঘণ্টা সকলের কাছেই উপভোগ্য, যে আনন্দ টিকিটের দামে কেনা হইয়াছে তার ফাউ। একেবারে অপরিচিত না হোক এই আলো-ঝলমল গুঞ্জনধ্বনি-মুখরিত ঘনীভূত আধুনিকতার জগতে সময় কাটানোর অভ্যাস যশোদার নাই। সকলের আগে যশোদার মনে হয় চারিদিকের দেয়াল আর ছাদগুলি যেন শিশুকে ভুলানোর জন্তে মুখে রঙ-মাখা সুন্দরী মেয়ের মত অসহ্য কৌতুকের উদ্ভট মুখভঙ্গি করিয়া আছে। ঘরের দেওয়ালে, আনাচে-কানাচে সর্ব্বত্র হাস্তকর অনিয়ম। কোণগুলি কোণ নয়, রেখাগুলি সাপের মত আঁকা বাকা, এখানে ওখানে দু'চার হাত সমতল স্থান যদি বা থাকিয়া গিয়াছে রঙের কায়দায় সেখানটাও দেখাইতেছে উঁচুনীচু। কেমন পচ্ছন্দ মানুষের কে জানে, এমন খাপছাড়া ভঙ্গিতে ঘর তৈরী করে আর ঘর সাজানোর মধ্যে এমন কুৎসিৎ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে!

হল ইতিমধ্যেই প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল, এখনও ক্রমাগত লোক ঢুকিতেছে—ছোট বড় গৃহস্থ পরিবার, স্কুল কলেজের যুবক, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাই বেশী, রঙীন শাড়ী আর গয়নায় সাজানো পুতুলের মত বৌ আর তার স্বামী, কোন কোন স্বামীর কোলে একটি শিশু, আবার অনেক দলে অল্পবয়সী মেয়ে বৌ-এর সঙ্গে বাড়ীর বয়স্কা গৃহিণীও আছে, সাজগোজটা তার একেবারে তুচ্ছ নয়।

যশোদার মনে হয়, এরা সকলেই যেন তার চেনা মানুষ—ঠিক

সামনের সিটের গল্প-বিভোর প্রেমিক প্রেমিকা দু'টিকে যেমন চেনে, খানিক তফাতে পাশাপাশি প্রায় তিন গণ্ডা সিট দখল করিয়া যে পরিবারটি বসিয়াছে তাদেরও তেমনি চেনে। সবাই যেন তার প্রতিবেশী, পাশের বাড়ীর লোক।

কুমুদিনী বলিল, 'ভিড় হয়েছে তো খুব।'

সুব্রতা সগর্ব্বে বলিল, 'বলিনি ভাল ছবি? কতদিন হল চলছে, এখনো ভিড় হয়।'

যোগমায়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে শুধু চারিদিকে চাহিতেছিল আর কেউ তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চাহিয়া নাই বলিয়া জ্বালা বোধ করিতেছিল। জমকালো শাড়ী গয়নার অভাবে তার মনে হইতেছিল ভিড়ের মধ্যে সে যেন একটু উলঙ্গ হইয়া বসিয় আছে। কি ভাগ্যে চেনা কারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় নাই!'

যশোদাও চুপ করিয়াছিল। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে হইতেই সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কখন নন্দ পর্দ্দায় আসিবে!

'কত দেরী ছবি সুরু হতে?'

'এইবার সুরু হবে।'

যশোদার আগ্রহে সুব্রতা মনে মনে একটু হাসিল। যারা কখনো সিনেমায় আসে না, তারা এই রকম অধীর হইয়া পড়ে।

তারপর ঘর অন্ধকার করিয়া ছবি আরম্ভ হইল। যশোদা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে পর্দ্দায় নন্দের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? এলোমেলো কতকগুলি নরনারী পর্দ্দায় নড়াচড়া করিয়া আবোল-তাবোল কি সব

বলি গেল, তারপর আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুব্রতা কি ভুল করিয়াছে ?

যশোদা সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কই সেই ছেলেটা তো গান করল না ?'

সুব্রতা সবজান্তার মত বলিল, 'বই তো এখনো আরম্ভ হয়নি। বেশী বড় বই হ'লে হাফ-টাইমের আগে দেয়। ছোট বই হ'লে শীগ্‌গির হাফ-টাইম দিয়ে, পরে দেয়। কমিকটা সুন্দর হয়েছে, না ?'

যোগমায়া সব-ভুলিযা-যাওয়া উজ্জ্বল হাসির সঙ্গে বলিল, 'সত্যি। কি জব্দই হ'ল ছেলেটা মেয়েটার কাছে! বিয়ে করে তবে রেহাই।'

কুমুদিনী বলিল, 'জব্দ হল কিনা কে জানে!'

যোগমায়ার হাসি আরও উছলিয়া উঠিল: 'সত্যি! ঠিক্! বিয়ে করতেই তো চাইছিল।'

কমিক ? বিয়ের কমিক ? যশোদা রাগ করিয়া সোজা হইয়া বসে। এমন কেন হইয়াছে আজকাল, চোখের সামনে যা ঘটে তাও চোখে পড়ে না ? মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ ঘটিয়াছে, মনে কষ্ট হোক, তাতে যশোদার আপত্তি নাই। হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত দিশেহারা হইলে চলিবে কেন ?

আসল ছবি আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দের আবির্ভাব ঘটিল। নন্দই বটে, কিন্তু যেন কোন্ দেশী নন্দ, একেবারে চেনাই যায় না। সায়েব বাড়ীর একটা ঘরে বাঙ্গালী বাড়ীর একটা মেয়ে অর্গান বাজাইয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময় আসিল সায়েবী পোষাক পরা নন্দ। গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েটি টেরও পাইল না কেউ ঘরে

আসিয়াছে, তারপর চমকমারা, লজ্জাভরা আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে তাড়া-তাড়ি অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। তারপর অনেকক্ষণ একটি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে আর অতি বুদ্ধিমান ছেলের কথাকাটাকাটি, হাসি তামাসা অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলিতে লাগিল। প্রথমেই নন্দ একটা গান শোনানোর অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং মেয়েটি বলিয়াছিল নন্দর মত গায়কের সামনে সে কিছুতেই গান করিবে না; ধেৎ, তাই কি সে পারে, তার লজ্জা করে না বুঝি? মনে হইতে লাগিল, এ তর্কের জের যেন তাদের মিটিবে না। কথায় কথায় অন্য কথা আরম্ভ করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে কত কথাই যে তারা দর্শকদের জানাইয়া দিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কত বাড়ীর লোক আর বাহিরের কত বন্ধু ও বান্ধবী বাজে ছুতায় আসিয়া দর্শকদের কাছে কৌশলে নিজেদের পরিচয় জানাইয়া চলিয়া গেল, তার পরে ও দু'জনের মধ্যে কে আগে গান করিবে এ সমস্যা ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

'কেন শুনতে চাইছ গান?'

'তোমার গান বলে।'

'তার মানে আমি গাইতে পারি না। আমার গান বলে কোনরকমে শুনবে।'

''তোমার চেয়ে গান দামী, গানের চেয়ে তুমি দামী। গানে গানে সুরের মূর্ছনায় তুমি যখন জগৎ ভরে দাও, আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

'আমিও। তুমি আগে গাও।'

'না, তুমি আগে।'

কি মানে দু'জনের এই কথা কথাকাটির? যশোদা ভাবিয়া পায় না। সে তো জানে না দু'জনের গান সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল বাড়ানোর এটা কৌশল।

তখন নন্দ বলিল, 'দু'জনে মিলে সেই গানটা গাই এসো।'

অর্গানের ধারে-কাছেও কেউ গেল না, নেপথ্যে কোথায় যেন গান আরম্ভ হওয়ার আগেই বাজনা বাজিয়া উঠিল—বাঁশী, বেহালা, হার-মোনিয়াম, তবলা ইত্যাদির ঐক্যতান।

পালা করিয়া দু'জনে গান গায়, কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধরি ধরি করে, চোখে চোখে চাহিয়া থাকে, হঠাৎ পাক দিয়া তফাতে সরিয়া যায়। সকলে মুগ্ধ হইয়া ছাখে আর শোনে।

যশোদা যাত্রায় এরকম ডুয়েট্ গান অনেক শুনিয়াছে, তবে এতটা খাপছাড়া আর মার্জ্জিত নয়। যাত্রার ডুয়েট্ গান যেন কাহিনী, আবেষ্টনী আর অভিনয়ের সঙ্গে বেশ মানায়।

তবে এখানে নন্দ আছে।

পর্দ্দার কাহিনী আগাইয়া চলে, কোন্ দেশের মানুষের কোন্‌শ্রেণী কাহিনী বুঝিয়া উঠিতে গিয়া যশোদার ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। যে ঘটনা ঘটা উচিত সে ঘটনা ঘটে না, যার যে কথা বলা উচিত সে সে-কথা বলে না, অথচ মাঝে মাঝে ঘরোয়া ঘটনা উঁকি দিয়া যায়, ঘরোয়া কথা কানে আসে।

আগাগোড়া সবটা রূপকথা হইলে বোধ হয় যশোদা এতটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত না। রূপকথাতেও আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য থাকে। যশোদা যখন ভাবে, এইবার নন্দ রাগ করিবে, নন্দ তখন হাসা হাসি

হাসে, নন্দর হাসি দেখিবার আগ্রহে যশোদা যখন সামনে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, নন্দ তখন রাগে আগুন হইয়া ওঠে।

যশোদার নিজেরই তখন রাগ হয়।

তারপর দেখা দেয় সুবর্ণ সুবর্ণ একটি অপ্রধান পার্টে নামিয়াছে, অল্পবয়সী বৌ-এর পার্টে। এই পার্টটিই বোধ হয় সে ভাল অভিনয় করিতে শিখিয়াছে।

যশোদাকে সহজে চমক দেওয়া যায় না, সে ধীরে ধীরে নাড়া খায়। সুবর্ণের উপর যশোদা বিশেষ খুসী ছিল না, ছবি শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটার জন্য তার যেন বেশ মারা জন্মিয়া যায়। মনের তলে একটা আশা যশোদার ছিল বৈকি যে একদিন নন্দ আর সুবর্ণ ফিরিয়া আসিবে, দু'জনকে সে ক্ষমা করিবে আর ভাই ও ভাই-এর বৌকে নিয়ে সংসার করিয়া চলিবে সুখে। এখন মনে হইতে থাকে, নন্দ যেন তার সে আশা চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তার ঘরের বৌকে করিয়া দিয়াছে সিনেমার অভিনেত্রী। জীবনে আর কোনদিন সে তার বাড়ীতে বৌ সাজিয়া থাকিতে আসিবে না।

যশোদা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, আমার মত ভাগ্যবতী সংসারে কেউ নেই। আমি যা ধরতে যাই তাই ফসকে যায়। যে সুখ আমার জোটা উচিত ছিল, তা জোটে না। মরণও হচ্ছে না সেই জন্য ?

বাড়ী ফিরিবার পথে সুব্রতা জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে দিদি ?'

যশোদা সংক্ষেপে বলে, 'বেশ।'

রাজেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে যশোদার মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। মন্তব্য করে কুমুদিনী।

বলে, 'ছেলেটা ঠিক আমাদের নন্দর মত নয়? গলার আওয়াজটা পর্য্যন্ত একরকম। প্রথমটা আমি তো—'

কেদার বলে, 'আহা, চুপ কর না?'

কুমুদিনী ফোঁস করিয়া ওঠে, 'কেন চুপ করব কেন?'

যশোদা ধীরে ধীরে বলে, 'নন্দর মত নয়, ওই আমাদের নন্দ।'

'ওমা সে কি কথা গো?'

প্রথমে খানিকক্ষণ কুমুদিনী পলক না ফেলিয়া চাহিয়া থাকে, তারপর যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যা সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এইরকমভাবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া বলে, 'হুঁ, তাই তো বলি, জনে জনে কি এমন মিল থাকে। কেমনধারা সাজ পোষাক করেছে তাই, নইলে কি আর চিনতে একদণ্ড দেরী হ'ত। নন্দ বায়স্কোপ করছে!'

যোগমায়া ধীরে ধীরে বলে, 'আমি দেখেই চিনেছিলাম।'

এ সব আলোচনা যশোদার সহ্য হয় না। সে বিরক্ত হইয়া বলে, 'চেনা মানুষকে চিনবে, তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কি যেন আরম্ভ করে দিয়েছ তোমরা।

মনে মনে যশোদা ভাবে, নন্দকে চিনিতে পারিল, সুবর্ণকে কেউ চিনিতে পারিল না কেন?'

সমস্ত পথ গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবে কুমুদিনী, বাড়ী ফিরিয়া যশোদাকে একান্তে টানিয়া নিয়া বলে, 'বলি চাঁদের-মা, একটি বৌ দেখলাম জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বোনের মত, সে বুঝি—'

'সে সুবর্ণ।'

'মাগো! এসব কি!—'

কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি শুধু আশ্চর্য্য হয় নাই, ভয়ও পাইয়াছে।

পরদিন সকালে রাজেনকে ডাকিয়া যশোদা বলিল, 'একটা কাজ করে দেবে?'

এ রকম ভূমিকা করা যশোদার স্বভাব নয়। রাজেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।'

'কি কাজ?'

'নন্দর ঠিকানাটা জেনে আসবে?'

'নন্দর ঠিকানা জেনে করবে কি চাঁদের-মা?'

যশোদা হাসিল।—'বেশ মানুষ বটে তুমি, বেশ কথা সুধোচ্ছো।'

রাজেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'মানে, কি জান চাঁদের-মা, আসবার হ'লে নন্দ নিজেই আসত আগে। বায়স্কোপে পার্ট করলে নাকি ঢের পয়সা পাওয়া যায় শুনেছি, ওর তো পয়সার অভাব নেই—'

'পয়সার কথা নয়, নিজে থেকে ফিরে আসতে হয়তো সাহস পাচ্ছে না।'

তখন নন্দর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আনিবার কথা দিয়া রাজেন চলিয়া গেল, যশোদা গেল সত্যপ্রিয়ের বাড়ী।

হঠাৎ তার মনে হইয়াছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে ঝোঁকের মাথায় বাড়ী ছাড়িয়া গেলে যে অনেক সময় সাধ থাকিলেও ফিরিয়া আসিতে ভরসা পায় না, একথাটা সত্যপ্রিয়কে বুঝাইয়া বলা দরকার।

যামিনী স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক, বৌকে নিয়া নিজের ভিন্ন সংসার পাতুক, যশোদার তাতে কোন আপত্তি ছিল না। মানুষের মধ্যে এরকম তেজই সে পছন্দ করে। কেবল যোগমায়ার সন্তান-সম্ভাবনার জন্য এসময়টা তাকে নিয়া এরকম টানা-হ্যাঁচড়া করা সঙ্গত নয় বলিয়া প্রথমটা সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এতকাল যে অনায়াসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়াছে আর কয়েকটা মাস সে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না? বীরত্ব বা মনুষ্যত্ব তো পাগলামী নয়। বেহিসাবী তেজ দেখানো গোয়ার্ত্তুমির সামিল।

প্রথমে যামিনী বুক ফুলাইয়া বলিত, কুঁড়ে ঘরে না খাইয়া দিন কাটাইবে তবু আর জীবনে কখনও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিতে যাইবে না। কিন্তু এখন মুখেও আর সে ওসব কথা বলে না। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন যাচিয়া গিয়া সত্যপ্রিয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িবে, তাকে কোনমতেই আটকানো যাইবে না। নিজের পায়ে ভর দিয়া কুঁড়ে ঘরে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার মানুষ সে নয়—একটু নরম হইয়া থাকিলেই সত্যপ্রিয়ের রাজপ্রাসাদে আরামে জীবন কাটানোর সুযোগটা অন্তত যতদিন সামনে উপস্থিত আছে। যোগমায়ারও এ জীবন সহ্য হইতেছে না। এরকম অবস্থায় ওদের এখানে রাখিয়া কষ্ট দিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যদি যাইতে হয়, ক'মাস পরে যাওয়ার চেয়ে, যোগমায়ার দিক হইতে ধরিলে, এখন যাওয়াই ভাল।

তাছাড়া আরেকটা কথাও যশোদার মনে হইতে থাকে—ওদের দু'জনকে বাড়ীতে রাখিয়া সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়া যাইবে ভাবিয়া নিজের খুসী হওয়ার কথা। প্রতিহিংসার জন্য ওদের কেন সে কষ্ট দিবে?

এই অন্যায় কল্পনা মনে আসিয়াছিল বলিয়া এখন তাহার মনে হয়, ওদের ফিরিয়া যাওয়ার উপায়টা তারই করিয়া দেওয়া উচিত।

সত্যপ্রিয় কাগজ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল. 'এসো চাঁদের-মা।'

খানিক তফাতে মেঝেতে জাঁকিয়া বসিয়া যশোদা নির্ব্বিকার ভাবে বিনা ভূমিকায় বলিল, 'মেয়েকে এবার ফিরিয়ে আনুন ?'

'মেয়েকে ফিরিয়ে আনব ? আমি ?'

'তাতে দোষ কি বলুন ? বাপ তো আপনি ? বড় কাঁদাকাটা করছে খুকী। এ সময়টা খুকীর পক্ষে—ছেলেমেয়ে হবে ওর জানেন না বোধ হয় ?"

'জানি।'

শুনিয়া যশোদা একটু চুপ করিয়া রহিল।

'জেনেও ওদের যেতে দিলেন ?'

'আমি যেতে বলিনি। ওরা নিজেরাই গেছে।'

'আটকানো উচিত ছিল আপনার।'

'কি করে আটকাতাম ? পায়ে ধরে ?'

যশোদা তাড়াতাড়ি বলিল, 'ছি, ওকথা বলতে নেই। অকল্যাণ হয়। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ওদের ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ তো, ওরা কি বোঝে? ফিরে আসবার জন্য মেয়েজামাই আপনার পাগল হয়ে আছে, কেবল না ডাকলে ভরসা পাচ্ছে না আসতে। আপনি যদি ডেকে পাঠান—'

সত্যপ্রিয় তার পরিচিত মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, 'ডেকে পাঠালেই তো ওরা মাথায় চড়ে বসবে, চাঁদের-মা।'

যশোদা অবাক হওয়ার ভাণ করিয়া বলিল, 'মাথায় চড়ে বসবে? আপনার? আপনার সামনে মুখ তুলে কথা কইবার সাহস ওদের আছে কিনা সন্দেহ, মাথায় চড়বে! তাছাড়া, বেয়াদবি যদি একটু করেই, মেয়ে-জামাইকে সিধে রাখতে পারবেন না?'

সত্যপ্রিয় ভাবপ্রবণতার চিহ্নও দেখাইল না, শান্তভাবে বলিল, 'ওরা নিজে থেকেই আসবে।'

যশোদাও তা জানিত, কিছুক্ষণ সে আর বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। সত্যপ্রিয়ের নির্ব্বিকার ভাব যশোদাকে সত্যসত্যই দমাইয়া দিয়াছিল। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কথা বলার এই একটা মস্ত অসুবিধা, এত সহজে সে মানুষের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ, উৎসাহ, হতাশা এসব যেন নিজের ইচ্ছামত পরের মধ্যে সংক্রামিত করিবার ক্ষমতা তার আছে। সত্যপ্রিয়ের উদাসীনতা দেখিয়া মনে হয়, মেয়ে-জামাই-এর কথাটা আলোচনা করাও সে প্রয়োজন মনে করে না। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, সংসারে এমন অনেক হয়, আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এজন্য মাথা-ঘামানোর কিছু নাই। যশোদারও মনে হইতে থাকে, ব্যাপারটা সে যত গুরুতর মনে করিয়াছে, হয়তো তেমন কিছুই নয়। এবিষয়ে আর কিছু না বলাই উচিত। তবে কোন কাজ আরম্ভ করিয়া মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দেওয়া যশোদারও স্বভাব নয়।

'তা হয়তো আসবে, কিন্তু তার তো দেরী আছে। খুকীর মুখ

চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাই ভাল। আপনার ছেলেকে যদি পাঠিয়ে দেন—'

সত্যপ্রিয় মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কাউকে পাঠাতে পারব না।'

কথাটা সে এমন স্পষ্টভাবেই বলিল, যে মাথা নাড়িবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যশোদা হাঁটু গুটাইয়া মেঝেতে ডান হাতের তালু পাতিয়া একটু কাত হইয়া মেঝেতে মেয়েদের বসিবার চিরন্তন ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়ানোর ভূমিকা হিসাবে সে এবার সোজা হইয়া বসিল। আর তার কিছুই বলিবার নাই।

সত্যপ্রিয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরা বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে?'

যশোদা বলিল, 'না।'

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কথা বলিবার সময় সে কদাচিৎ শ্রোতার মুখের দিকে তাকায়। এবার যশোদার চোখে চোখ মিলাইয়া সে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, 'অন্য কেউ একথা বললে বিশ্বাস করতাম না চাঁদের-মা। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি কখনো মিথ্যা বল না।'

সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টি দেখিয়া যশোদা এক মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিয়াছিল। যশোদার স্নায়ুগুলি এরকম শিহরণের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই; রাতদুপুরে হঠাৎ বাড়ীর অন্ধকারে একটা ভূত দেখিলেও সে ভাল করিয়া চমকাইয়া ওঠে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সত্যপ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে-ভাষা তার স্পষ্ট চোখে পড়িয়াছে ভূত দেখার চেয়ে তা চমকপ্রদ। [illegible] চোখে একদিন যশোদা এ ভাষা দেখিয়াছিল, তবে

সত্যপ্রিয়ের চোখের এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক ক্ষুধার সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সেই মৃদু কামনার অভিব্যক্তির তুলনাই হয় না। হঠাৎ যশোদার একটা অদ্ভুত ধরণের লজ্জা বোধ হয়, অনেকদিন সেরকম লজ্জার সঙ্গে তার পরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল।

চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি নিভাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'তবু, মেয়ে-জামাইকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি কিছু করতে পারব না চাঁদের-মা। তুমি নিজে যখন এসেছ, আমার মেয়ের ভালর জন্য এসেছ, তোমার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি—ওদের ক্ষমা করলাম। তুমি গিয়ে ওদের বলতে পার, ওরা যদি ফিরে আসে আমি ওদের কিছু বলব না।'

বাড়ী ফিরিয়া যশোদা নিজের বিস্ময়ে নিজেই হতবাক্ হইয়া থাকে। তার জীবনে কখনও এমন সমস্যা উদয় হয় নাই। যা সে দেখিয়া আসিয়াছে সত্যপ্রিয়ের চোখে, তাই কি ঠিক? অন্য আর কি হইতে পারে? যেভাবে সত্যপ্রিয় তাকে দু'চোখ দিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল তার তো অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়? কিন্তু সত্যপ্রিয়ের পক্ষে কি ওটা সম্ভব? বিশেষতঃ তাকে দেখিয়া? তার মত বিরাটকায়া মাঝবয়সী রমণীকে সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সত্যপ্রিয়ের মত প্রৌঢ় মানুষের মধ্যে জোয়ারের আকস্মিক বন্যার মত প্রচণ্ড কামনার উদ্রেক হইতে পারে, এ তো বিশ্বাস করার মত কথা নয়।

চোখ বুজিয়া বাস্তবকে এড়ানোর ছেলেমানুষী যশোদার মধ্যে নাই। সে জানে, সত্যপ্রিয়ের মত সবল সুস্থ সংযমী মানুষ প্রৌঢ়ত্বে

পৌঁছিয়াছে বলিয়াই নিভিয়া যায় না। আকস্মিক এবং হয়তো ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের অসংযমকে একেবারে বর্জ্জন করা মানুষের পক্ষে কঠিন। রামায়ণ মহাভারতে যশোদা মুনিঋষিরও অনেক অসংযমের কাহিনী পড়িয়াছে। কিন্তু সে সব হঠাৎ-জাগা ভালবাসা জাগাইত অনন্যসাধারণ রূপবতী যুবতী মেয়েরা। যশোদাকে দেখিলে রাস্তার গুণ্ডাও যে ভড়কাইয়া যায়!

সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভাল করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়ই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর। সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এরকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না,—তার মত হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে। মানুষকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখার কামনা সম্বন্ধে হয়তো সে অসংযত, নিজের মতামত প্রচার করার স্বপ্ন দেখিবার বেলা হয়তো সে অবাস্তব, অসম্ভব কল্পনার ক্রীতদাস,—কিন্তু তাও যেন ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বলতা, জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে একটু খেয়াল খেলার সুযোগ দেওয়া।

অথবা মোটের উপর মানুষটা আসলে পাগল?

এই সব চিন্তায় কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। সহরতলীর উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ীর উপর দিয়া নূতন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ী আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে। বাড়ী বিক্রয় করার বিরুদ্ধে আর নির্দ্ধারিত মূল্যের বিরুদ্ধে যশোদার যদি কিছু বলিবার থাকে, নির্দ্দিষ্ট একটি দিনের মধ্যে যশোদা যেন তার লিখিত আবেদন দাখিল করে।

ইংরাজীতে লেখা নোটিশ, যামিনী তাকে সমস্তটা পড়িয়া শুনাইয়া মানে বুঝাইয়া দিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া যশোদা বলিল, 'বাড়ী বেচতে হবে?'

যামিনী বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি! আপত্তির কথাটা বাজে, ওরা আপত্তি কানে তোলে না।'

'আমি বেচতে না চাইলেও বেচতে হবে?'

'তাই তো আইন—রাস্তার জন্য কিনা! তবে ওরা দাম ভাল দেয়—এখানকার বাড়ী বেচে অন্য জায়গায় বাড়ী করবেন।'

যশোদা বিশ্বাস করিল না। নোটিশ-হাতে পাড়ার রমেশ উকিলের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। ফিরিয়া আসিয়া ছাথে, রাজেন বসিয়া আছে।

'কি ব্যাপার চাঁদের-মা?'

'আবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।'

আগে আর কখনো যশোদা পাততাড়ি গুটায় নাই, কেবল গুটানোর

উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয়, পাততাড়ি গুটাইয়া গুটাইয়াই যেন তার জীবন কাটিয়াছে।

রাজেন হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দেখি, প'ড়ে দেখি একবারটি কি লিখেছে।'

'এর মধ্যে খবর পেয়েছ?' বলিয়া যশোদা নোটিশটি তার হাতে দিল। গম্ভীরভাবে নোটিশ পড়িয়া নিরুপায় আপশোষের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁ:! ওই হনুমানটার কাজ আর কি!'

যশোদারও কথাটা মনে হইয়াছিল, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় নাই। সহর আর সহরতলীর উন্নতির জন্য যারা মাথা ঘামায়, তাদের সঙ্গে সত্যপ্রিয়ের সম্পর্কই বা কোথায়? তাছাড়া, ক'দিন আগে সত্যপ্রিয়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাও যশোদা ভুলিতে পারিতেছিল না।

রাজেন আবার বলিল, 'মেয়ে-জামাইকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ কি-না, তার শোধ তুলল।'

সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যোগমায়া হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেল, 'আমাদের কথা বলছ তুমি! বাবার কথা বলছ! আমার বাবাকে তুমি হনুমান বললে?'

রাজেন বলিল, 'শুধু হনুমান? তোমার বাবা—'

যশোদা বলিল, 'আহা, থামো না বাবু, তোমারও কি মাথা খারাপ হল?'

এখানে আর বেশী সহানুভূতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া যোগমায়া কাঁদিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেল।

যশোদা বলিল, 'কিন্তু চকোত্তি মশায়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি?'

রাজেন বলিল, 'সম্পর্ক আর কি, ও-ব্যাটার কোম্পানী থেকে এ-পাড়ার সব ঘরবাড়ী জমিজমা কিনে নিয়েছে তো, তুমি আর আমি শুধু বেচিনি। তারপর বলে দিয়েছে, এখান দিয়ে রাস্তা গেলে সুবিধা হবে।'

'তুমি আর আমি যদি বলি এখান দিয়ে রাস্তা যেতে দেবো না? একটু তফাৎ দিয়ে—?'

রাজেন মাথা নাড়িল, 'আমররা দু'জন বললে কি হয়ে, সবাই বললে তবু ভরসা ছিল। তা সবাই তো আগেই ঘরবাড়ী বেচে বসে আছে। তাছাড়া ওই হনুমানটার কথা ফেলে আমাদের কথা কে শুনবে বলো? আমরা হলাম গরীব মানুষ।'

যোগমায়ার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সত্যপ্রিয়ের ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞার কথাটা যশোদা তাদের শোনায় নাই। আপনা হইতে এরা যদি ফিরিয়া যায়, আর গিয়া ত্যাখে যে, সত্যপ্রিয় একটুও রাগ করে নাই, দু'জনেই খুব খুসী হইবে। ভাবিয়াছিল, নিজেই বুঝাইয়া দু'জনকে পাঠাইয়া দিবে।

রাজেন কাজে চলিয়া গেলে যশোদা যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি তো চললাম, আপনারা এবার কি করবেন?'

যামিনী ইতিমধ্যে একবার ঘরে গিয়া বাপের অপমানে অপমানিতা যোগমায়ার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, 'তাই ভাবছি।'

'ফিরেই যান না?'

'তাই যাই, কি বলেন?'

'সেই ভাল। আমার মনে হয়, চকোত্তি মশায় রাগ করেন নি, আপনারা ফিরে গেলে খুব খুসী হবেন।'

যামিনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'ফিরেই যদি যেতে হয়, দেরী করা বোধ হয় উচিত হবে না। যেতে হলে আজকেই চ'লে যাই। আপনি কি বলেন ?'

'তাই যান।'

অজিতের দিকে চাহিয়া যশোদা হাসিয়া বলিল, 'তোমরা কি করবে ভাই ?'

অজিত বলিল, 'এই তো সবে নোটিশ এলো, এখনও ঢের দেরী। বাড়ী বেচে সবঠিকঠাক করে উঠে যেতে বছরখানেক তো অন্ততঃ লাগবেই —ইচ্ছে করলে বেশীও লাগাতে পারেন। আমরা কি করব, ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেই হবে।'

যশোদা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, 'দেরী নেই ভাই, দু'চার দিনের মধ্যে আমি উঠে যাব, যত শীগ্‌গির পারি। এখানে আর মন টিকছে না। দু'দিন বাদে উঠে যেতেই হবে ভাবব আর দিন গুণে দিন কাটাব— বাপ্‌রে, আমার দম আটকে আসবে।'

'আমরা তবে অন্য কোথাও ঠিক করে—'

সুব্রতার কথার উৎস অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছিল, চোখ দু'টি একটু যেন ছলছল করিতেছিল। অজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলিয়া উঠিল, 'অন্য কোথাও না ছাই, আমরাও দিদির সঙ্গে যাও। তোমায় আর আমি ছাড়ছি না দিদি, ম'রে গেলেও না—যেখানেই যাও তুমি আমি তোমার সঙ্গে যাবই যাব। হুঁ, বলে এতকাল পরে সত্যিকারের

একটা দিদি পেলাম, দিদি যাবে এক যাগায়, আমরা যাব আর এক যাগায়! কি যে বল তুমি!'

অজিত তাড়াতাড়ি বলিল, 'আমি এমনি বলছিলাম।'

সুব্রতার গালটা একটু টিপিয়া দিয়া যশোদা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ছোট ছোট দু'টি উনুনে রান্না হইতেছে, একটি তোলা উনুন। আগে একবার যখন যশোদার ভরাট বাড়ী খালি হইয়া গিয়াছিল; চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বড় বড উনুনগুলি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই উনুনগুলিও আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কোথায় যাইবে? কোথাও বাড়ী কিনিয়া উঠিয়া যাইবে, না নন্দের বাড়ীতে গিয়া উঠিবে? রাজেন নন্দের ঠিকানা আনিয়াছে, নন্দ নাকি এখন বড়লোক, তার বসিবার ঘরে গদি-আঁটা চেয়ার। সেখানে কি থাকিতে পারিবে যশোদা? কিন্তু যেখানেই যাক, উনুনগুলি আবার তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

সমাপ্ত